CADENCE

ANNUAL MAGAZINE

2022

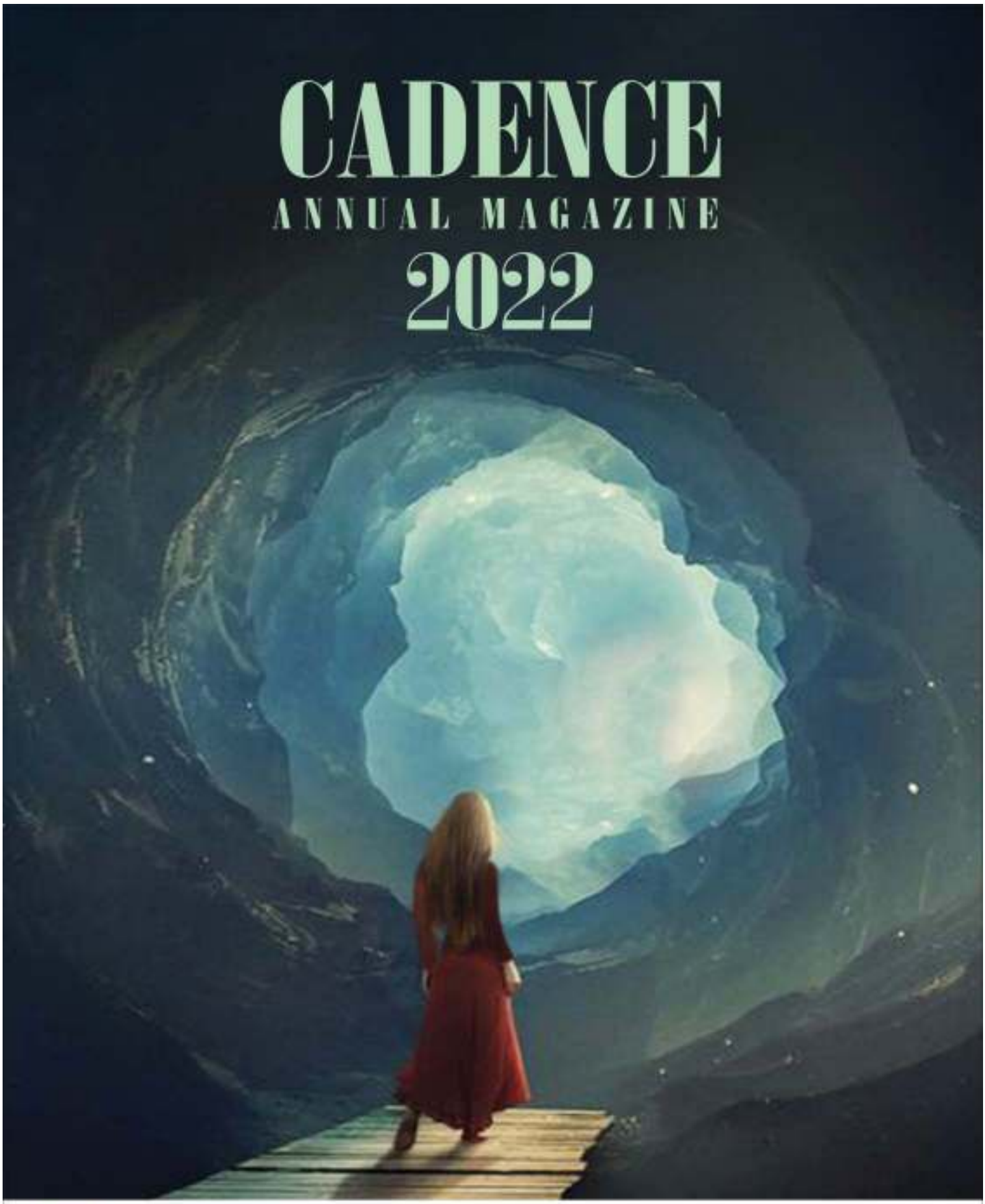

BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS

Cadence

বার্ষিক ম্যাগাজিন - ২০২২

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা	: **মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুব-উল আলম,** এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি
প্রকাশকাল	: ডিসেম্বর ২০২২
বিইউপি বার্ষিক প্রকাশনা	: পঞ্চম
প্রকাশক	: বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
সহায়তাকারী	: কম্পিউটার অপারেটর মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী। কম্পিউটার অপারেটর মোঃ রাজীব হোসেন। কম্পিউটার অপারেটর মোঃ ফারুক হোসেন। গ্রাফিক্স ডিজাইনার মাহমুদুর রহমান (ডিজাইন অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন)।

প্রকাশনায়

পাবলিক রিলেশন্স, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮-০২-৮০০০৩৬৮
পিএবিএক্স: ৮০০০২৬১-৪
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮০০০৪৪৩
ই-মেইল: info@bup.edu.bd, ওয়েবসাইট: www.bup.edu.bd

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মেজর জেনারেল মোঃ মাহ্‌বুব-উল আলম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি

উপদেষ্টা

অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন

প্রধান সমন্বয়কারী

এয়ার কমডোর মোঃ মামুনুর রশীদ, বিইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, এডিডব্লিউসি

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে এম জিয়াউল হক, বিইউপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এটিসি

লেঃ কর্নেল সিরাজ উদ্দিন আহমেদ (অবঃ)
পিএসসি

সহযোগী অধ্যাপক ড. ফাহমিদা হক

মেজর জিয়া মাহমুদ খান, আর্টিলারি

কমান্ডার আবুল খায়ের মোহাম্মদ জাকারিয়া,
(ট্যাজ), পিএসসি, বিএন

অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ
শওকত ওসমান

অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

সহকারী অধ্যাপক মোঃ মইনুল ইসলাম

সহকারী রেজিস্ট্রার ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম

সহকারী পরিচালক মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ

সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ ওসমান গণি

বাণী

উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

মানসম্মত উচ্চশিক্ষা এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে বিইউপি 'Outcome-based education' এবং 'Need-based education' প্রদানে বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি দেশীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার প্রতিও বিইউপি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় বিইউপির অভিজ্ঞ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তি ও সম্ভাবনার স্ফূরণ ঘটাতে পঞ্চমবারের মতো বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিন 'Cadence' প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিভিন্ন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, বিজ্ঞানমূলক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন মৌলিক লেখনিসমূহের মাধ্যমে; যা তাদের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন এবং আধুনিক চিন্তামনস্ক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

বিইউপির স্বল্প পথচলায় এই বহুমুখী কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি সৃজনশীল প্রতিভার প্রকাশ ঘটাবে বলে আমি মনে করি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, 'Cadence' ম্যাগাজিন শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও মূল্যবোধ জাগ্রত করবে এবং জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে, এ ম্যাগাজিনের সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি রইলো অভিনন্দন।

মেজর জেনারেল মোঃ মাহ্‌বুব-উল আলম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি

বাণী

উপ-উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, শীঘ্রই Cadence-এর পঞ্চম প্রকাশনা সম্পন্ন হতে যাচ্ছে। BUP-এর নৈমিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সৃজনশীল লেখালেখির অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে Cadence-এর ভূমিকা অপরিসীম। ছেলেবেলার স্কুল ম্যাগাজিনের মত বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ছোট ছোট হাসি-কান্না-গল্প-গাঁথা প্রকাশনার অনন্য প্রয়াস এটি। নিজের অজান্তে নিজের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা সৃষ্টিশীলতা আবিষ্কারের কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে এটির গুরুত্ব অপরিসীম। নিজেকে নতুন করে চেনার এবং হারিয়ে যাওয়া নিজেকে খুঁজে পাওয়ার প্রয়াসও এটি। পাশাপাশি সমাজ জীবনের সার্বিক বাস্তবতার প্রতিফলনও দেখা যায় Cadence-এর বিশ্লেষণাত্মক লেখায়। সৃজনধর্মী এই ম্যাগাজিনের আরেকটি বড় দিক হলো বিইউপিকে বৃহৎ পরিসরে পরিচিত করা যা ইতোমধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে Cadence-এর পূর্ববর্তী প্রকাশনাসমূহের মাধ্যমে।

Cadence-এর সাফল্য নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সদস্যের সহযাত্রায় আমি অভিভূত। হাজারো ব্যস্ততা আর আধুনিক যান্ত্রিক ও ডিজিটাল জীবনধারায় লেখনী হাতে বসার সময় এবং ইচ্ছা দুটোই হারিয়ে যেতে বসেছে। সৃজনশীলতার অগ্রযাত্রার পথে এটি একটি অনাহুত অশনি। Cadence এই অশনির বিরুদ্ধে সোচ্চার পথযাত্রা।

আমি এই সোচ্চার পথযাত্রার সাফল্য কামনা করছি।

M Hossain

অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন

প্রধান সমন্বয়কারীর বাণী

প্রধান সমন্বয়কারী
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

'Cadence' এর পঞ্চম প্রকাশনায় সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সাহিত্যচর্চা শিক্ষা কার্যক্রমের অপরিহার্য অংশ। এরই ধারাবাহিকতায় সৃজনশীল সাহিত্যের বিকাশ ঘটাতে ও সাহিত্যের রস আস্বাদনে বিইউপির এ মহৎ প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই।

আমি আশা করি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের লেখনির অনুরণন ভবিষ্যতে সৃষ্টিশীল ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গঠনে ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে, বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এয়ার কমডোর মোঃ মামুনুর রশীদ, বিইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, এডিডব্লিউসি

সম্পাদকীয়

প্রধান সম্পাদক
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

নিয়মিত সাহিত্য চর্চা শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে যা দেশের সচেতন এবং সংস্কৃতি মনা নাগরিক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে ২০১৮ সাল হতে ধারাবাহিকভাবে বার্ষিক ম্যাগাজিন 'Cadence' প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই ম্যাগাজিনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বিভিন্ন মৌলিক লেখা যেমন গল্প, কবিতা, ছড়া, রম্যরচনা, বিজ্ঞান ও ভ্রমণকাহিনী এবং বাংলার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন লেখা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন, মানুষিকতা ও চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে আমি সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্যদের এবং এই ম্যাগাজিনের সাথে জড়িত সকলকে তাদের মূল্যবান অবদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে এম জিয়াউল হক, বিইউপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এটিসি

"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

সূচিপত্র

বিইউপি ম্যাগাজিন-২০২২

ক্র/নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০১	Bangabandhu's World View and Peace Perception	Dr. Syed Anwar Husain	০১
০২	Bangladesh University of Professionals: A Flagship Military University of Bangladesh	Prof Maj Gen (Retd) Mohammad Quamruzzaman	০৫
০৩	Role of Office of Public Relations, Information, and Publications for Positive Branding of Bangladesh University of Professionals	Air Commodore Md. Mamunur Rashid	০৮
০৪	Bangladesh University of Professionals (BUP): From Antiquity to Future-Setting Example from "Mujib Shotoborsho"	Brig Gen Abdullah Al Mamun	১৬
০৫	Fight the Fatigue	Group Captain A K M Ziaul Haque	২২
০৬	An Unknown Tune	Niha Nahiun Chowdhury	২৫
০৭	Walking in Dhaka City	Rifa Tasnia	২৭
০৮	Hollowness	Ashrafun Naher Aananna	২৮
০৯	When Women Ruled the World	Major Tanvir Rahman	৩০
১০	Compulsion of Will	Jannateen Naoar Siena	৩৩
১১	The Economic Impact of Covid-19 on the Agricultural Sector in Bangladesh: Focus on Supply Chain Disruption	Mohammed Shariar Hossain	৩৪
১২	A Tale of a Coffin	Muhammad Nurul Islam	৩৮
১৩	Discovery of Death	Raufur Rahman	৩৯
১৪	What Do We Owe Other?	Shahrukh Khan Akash	৪০
১৫	My Mother	Md Rakib Hasan Rabbi	৪২
১৬	Does Foreign Remittance Work as a Socio-Economic Growth Engine?	Dr. Jannatul Ferdaous	৪৪
১৭	Motherly	Nuri Shahrin Suba	৪৫
১৮	Being a BUPian	Faria Fatima Roza	৪৭
১৯	Moments of the Sea	Tahsina Khan	৪৯
২০	Bangladesh from 'Unskilled Age to Access to Information (a2i)' Programme	Md. Ashiqur Rahman	৫০
২১	When Suicide Comes in Clusters: Depression or Copycat Effect?	Maliha Tabassum	৫২
২২	Perseverance	Mirana Tahsin	৫৫
২৩	Managing Human Resource amid the Covid-19 Pandemic: Strategies for a Better Life	Mohammad Ali	৫৬
২৪	Hunting Peace	Md Shariful Hasan Khan	৫৮
২৫	পৃথিবীর সবচেয়ে তেজস্ক্রিয় স্থান কোনটি?	সামিরা তাসনিম অপরাজিতা	৫৯
২৬	একটা রাজধানী "মানুষ"	তানভীর আহমেদ	৬১
২৭	'ফিকা': সুখী সুইডেনের সফল মন্ত্র	সঞ্জয় বসাক পার্থ	৬২
২৮	দূরত্ব	আসিফ হোসেন	৬৪
২৯	নিখিলের সাইকেল	মুসাব্বাত জামান	৬৯
৩০	প্রকৃতির সৌন্দর্যের খোঁজে	সুরভী আক্তার	৭১

৩১	নারী তুমি কেমন	ফয়সাল আল ইসলাম	৭৪
৩২	গবেষণায় হাতেখড়ি	ড. মোঃ মোস্তফিজুর রহমান	৭৫
৩৩	সন্ধান	তাসনুভা রহমান লাবিবা	৭৭
৩৪	উত্তরাধুনিকতা	আব্দুল্লাহ আল মাদানী	৮০
৩৫	জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা এক অনুকরণীয় সংস্কৃতি	তাহমিনা সুলতানা	৮১
৩৬	জাদুকর	মোস্তফা জামান কায়সার	৮৫
৩৭	শিশুদের স্থূলতা: অপুষ্টির এক মারাত্মক পরিণাম	মোছাঃ দিলশাদ শারমিন চৌধুরী	৮৬
৩৮	অগ্নি স্নানে শুচি হোক ধরা	জাওহারা রহমান জর্জিয়া	৮৯
৩৯	নিঃস্বার্থ ভালোবাসা	মোঃ তৌফিকুল ইসলাম	৯১
৪০	বাংলাদেশের উপজাতির বর্ষবরণ উৎসব	আল জামাল মোস্তফা সিদ্দাইনী (তমাল)	৯৩
৪১	আমার শহর ও আজকের নারী	আনিকা মেহের আমিন	৯৬
৪২	সুখ	মাহমুদুর রহমান	৯৮
৪৩	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) কী ও কেন	তোফায়েল আহমেদ	৯৯
৪৪	রক্তিম গোধূলি	জান্নাতুল ফেরদৌস	১০৩
৪৫	অপেক্ষা	আশিকুর রহমান	১০৭
৪৬	নিভৃতচারীর আর্তনাদ	মো: কাইয়ুম আলী	১১০
৪৭	বনসাই	রিজাল ফাতহেমী কবীর	১১১
৪৮	বন্ধুত্ব	রুমাইসা আহম্মেদ নাবা	১১৪
৪৯	কিছুই হারিয়ে যায় না	এইচ এম আবির হোসেন	১১৫

Bangabandhu's World View and Peace Perception

Dr. Syed Anwar Husain
Chair Professor
Bangabandhu Sheikh Mujib Chair

The quest for peace, at any level, is perpetual and universal. Nevertheless, peace is set at naught by human misdeeds, or human deeds with ulterior motives not peaceable. Chenghiz Khan, Halaku Khan and Hitler do occasionally surface in our mind as evil geniuses who threatened human and world peace. But, as against them, we have on record the names of personalities for whom peace was not only a dream, but vocation as well. A short list of whom include the English Jeremy Bentham (1748-1832) and German Immanuel Kant (1724-1804). Bentham's book "A Plan for Universal and Perpetual Peace" (1777); and Kant's book "Perpetual Peace" (1795), drew attention of a strife-torn Europe to the doable prospect of peace. Bangabandhu belonged to this genre of persons with his peace dream and vocation, not only for his Bangali people, but the people across the world. A pointer to such a peace intent of Bangabandhu is the note he scribbled on 30 May 1973

> *As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bengalee, I am deeply involved in all that concerns Bengalees. This abiding involvement is born of and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my politics and to my very being.*[1]

Bangabandhu's views on the world and world peace are to be gleaned from the 1972 Constitution (his major gift to the nation), nine speeches and a message. Moreover, Bangabandhu's travelogue titled New China 19522 also provides information specifically on his views on world peace. But the information of his attending the Stockholm Peace Conference (1956) is not available. Nevertheless, whatever records we have, are adequately explanatory of Bangabandhu's ideas specifically on peace, and world peace, in general.

Bangabandhu's Peace Perception: Theoretical Considerations

Bangabandhu knew it well that his Bangladesh, a country born out of the trauma of conflict and violence, would live well in the comity of nations provided peace through peaceable overtures between and among states. Thus, his peace-intention was, to all intents and purposes, Bangladesh -centric. In other words, he was perceiving an international civil society, wherein a network of states would complement each other's actions in creating and sustaining peace. This was, in fact, a redefining of international peace in terms of people's security. This was thus the recipe for a paradigm shift in international relations. It may be noted that this peace-paradigm was a continuation of Bangabandhu's

home recipe of peace through development of people; and, in this context, his Rajshahi speech of 9 May 1972 may be referred to, wherein he said, "What do I want? I want the people of Bangla get two square meals a day. What do I want? I want the jobless get jobs. What do I want? I want the people of my Bengal be happy. What do I want? I want my people move about in a jolly mood. What do I want? I want the people of Bangla smile again to their hearts content." Indeed, for Bangabandhu, peace was indivisible between domestic and international arenas. He was convinced that if people, both at home and the world across, are marginalized or victims of oppression and violence, peace would be negated or even threatened.

The egalitarian international society that Bangabandhu was dreaming for had the perspective of gap reduction in resources between the international haves and have-nots. In other words, he was voicing protest against the endemic and persistent international inequality. Indeed, Bangabandhu was a strong voice of protest against inequality of all types anywhere in the world.

The first government of Bangladesh, popularly known as the Mujibnagar Government, had in its Proclamation of Independence, three perceptive objectives for Bangladesh: equality, human dignity, and social justice. It would be not far-fetched to argue that Bangabandhu's world-view was conditioned by these three objectives. Indeed, he was not only the Bangabandhu (friend of Bengal); but viswabandhu (friend of the world) as well.

The Constitution and World Peace

Enshrined in the Article 25 of the 1972 Constitution are the words laying the foundation of Bangladesh foreign policy as well as that of world view of the newly-born state

The state shall base its international relations on the principles of respect for national sovereignty and equality, non-interference in the internal affairs of other countries, peaceful settlement of international disputes, and respect for international law and the principles enunciated in the United Nations Charter, and on the basis of those principles shall –

a. strive for the renunciation of the use of force in international relations and for general and complete disarmament;
b. uphold the right of every people freely to determine and build up its own social, economic and political system by ways and means of its own free choice; and
c. support oppressed people's throughout the world waging a just struggle against imperialism, colonialism or racialism.[3]

The goals set and the elaborative principles clearly show the peace intent and content of Bangladesh's relations with the outside world. Moreover, Bangabandhu's principle of "friendship with all, malice to none" was a peace-begetting recipe.

International Social Peace

The most pertinent document relating to Bangabandhu's knack for international social peace through social justice was his speech at the Algiers 4th Nonaligned Summit. In that speech he uttered the knee-jerking words (for imperialists and colonialists), "The world is divided into two

halves – oppressors and oppressed. I am on the side of the oppressed." This comment of Bangabandhu not only reflected his world view, but also pointed out that an end to oppression across the world was the pathway to peace.

Moscow hosted the World Congress of Peace Forces, held from 25 through 31 October 1973. In a message to this congress, sounding the Algiers rhetoric, he wrote, "At a time when people in different parts of the world are struggling against imperialism, colonialism and racialism and are striving for political and economic emancipation, such a Congress cannot but strengthen and inspire all those committed to the cause of world peace. The oppressed people of the world must liberate themselves from exploitation and man's injustice to man must end if the world is to enjoy a stable peace."[4]

World Peace

While drawing attention to the basics of world peace, Bangabandhu said, "In my opinion, people must have the right to food and clothing and to demand these things. At the same time, they must have the rights to express their own beliefs. If this is not allowed, the life of a man will become as hard as a stone."[5]

The people's Republic of China (PRC) hosted the Asia-Pacific Regional Peace Conference in Peking on 2-12 October 1952. Thirty seven (37) countries participated in this conference. Bangabandhu was a member of the Pakistan delegation. He rationalized world peace as he subsequently wrote, ". . We were agreeable to the idea of attending a conference organized by anyone in the world that wanted peace. Whether it was Russia, the United States, Britain or China – we were ready to work for peace at this time and to proclaim in unison with thousands voices – "Peace is what we want!"[6]

But Bangabandhu's voice of peace was heard more forcefully in his emotive speech delivered at the time of his receiving the Julio Curie Peace Prize from the World Peace Council at a ceremony held in Dhaka on 23 May 1973. As he said, "For the people of Bangladesh peace and freedom are mixed up." Moreover, emphasizing world peace he unequivocally said, "At the same time, I would like to mention categorically that world peace is the basic principle of the philosophy of my life. . . . . We support any great attempt at world peace, disarmament, and human welfare."[7]

The Commonwealth Heads of government meeting was held in Canada on 2-3 August 1973. At this meeting, Bangabandhu's voice was resonant, "I believe that the developed and developing countries have a common interest in maintaining our existence and in living peacefully. The arms race is a threat to humanity, which contains the threat of not only the total destruction, but also a colossal wastage of world resources."8 This was a message to big powers who spend a lot on the arms-making; and the message fell on their deaf ears, as we have not seen any let-up in the arms-making and armed conflict around the world. True, big arms have now been replaced by the to the common interest of humans was proffered. Third, while talking about the desired peace in the conflict-prone South Asian region, a concrete suggestion was made to replace "conflict and animus of the past with those of fraternity and cooperation." Finally, the Southeast Asian Zone of Peace

along with the Indian Ocean Zone of Peace was strongly supported. The South Asian peace figured prominently as Bangabandhu had spoken emotively at the dinner hosted by the Indian Prime Minister Indira Gandhi in Calcutta on 6 February 1972 (on Bangabandhu's first foreign trip to Calcutta, 6-8 February 1972). As he said, "Let there be an end permanently to the sterile policy of conflict among the neighbours. We should not waste our national resources, which we should use in developing standard of living of our people."[8] The same theme occurred in the speech he delivered at Daudkandi (Cumilla) on 4 March 1974.[9] These statements were the seeds out of which germinated the tree known as the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) in 1985.

Concluding Observations

The cruel birth of Bangladesh and the continuous struggle for emancipation preceding this birth, had convinced Bangabandhu of the rationale for peace, at home and across the world. At home, his recipe for peace was development of his people, so that they are blessed with a decent standard of living. Internationally, he had the same dream, and, for the realization of which, he argued for a restructured world order. In between, he had plans for regional peace, as well. Thus, no facet of the phenomenon/construct of peace escaped the cogitative mind of Bangabandhu.

Notes and References

1. Printed at the beginning of the book Sheikh Mujibur Rahman, The Unfinished Memoirs, translated by Fakrul Alam (Dhaka: The University Press Limited, Second impression, 2016).
2. Sheikh Mujibur Rahman, New China 1952 (Dhaka: Bangla Academy, translated by Fakrul Alam, 2021). The title should have been New China as I Saw.
3. The Constitution of the Republic of Bangladesh, Printed with latest amendment, April, 2018.
4. Excerpted from A.K.M. Atiqur Rahman, "Bangabandhu, the Thunder Voice for World Peace and Freedom", Daily Sun 15 August 1919. Emphasis added.
5. New China 1952, p.119.
6. ibid, 21.
7. Cited in Dr. Anu Mahmud, Bangabandhu: Jibanalekhya (vernacular) (Bangabandhu: Lifesketch) (Dhaka: Asia Publications, 2017), pp.321-23. The citation is translated from the original Bangla.
8. The Bangladesh Observer, 7 February 1972.
9. Cited in Syed Anwar Husain, Bangabandhur Parastraniti; Bangladesh, Daksin Asia O Sampratik Viswa (vernacular) (The foreign Policy of Bangabandhu, Bangladesh, South Asia and Contemporary World) (Dhaka: Agami Prokashoni, 1996), pp.23-24.

Bangladesh University of Professionals: A Flagship Military University of Bangladesh

Prof Maj Gen (Retd) Mohammad Quamruzzaman
Adjunct Professor
Faculty of Business Studies

Introduction

Higher education in a university means graduate and post graduate education in its organic and/or affiliated faculty, department, college, institute, academy and school. Latin *'universitas magistrorum et scholarium'* defines a university as the community of teachers and scholars irrespective of one's background: mathematics, science, humanities, business, philosophy, medicine, engineering, music, astronomy, arts, diplomacy, polemology etc. Bangladesh University of Professionals (BUP) is a flagship military university of Bangladesh that was established at Mirpur, Dhaka by BUP Act 2009. Article 17 of Bangladesh Constitution entrusts the State to adopt effective measures for the purpose of establishing a universal education system to meet the needs of local, regional and global societies.

Military concentrate on polemology: a multi-disciplinary area of higher education combining science, technology, engineering, and mathematics (STEM) with humanities, social science, business administration and strategy. Goal-4 of United Nations' (UN) Sustainable Development Goals (SDG) by 2030 mentions about Quality Education. Ramayana by Valmiki, Mahabharata by Vyasa, Theogony by Hesiod, Iliad and Odyssey by Homer depict conflicts and peace which are the primary sources of various -logy, -ism, -gony, -ics, -graphy, -gogy, -sophy in university education. Conversations of Krishna with Arjun at Kurukshetra, Haryana is the sacred Bhagavad Gita. Chaos of gods and goddesses as Titans and Olympians in Greece is mythical cosmogony.

Military in University Education

Polymath Pythagoras researched on trigonometry aiming victory of Croton over Sybaris in 510 BC. Athenian Captain Socrates coined the term Philosophy. Greek 'Phil' is love; 'Sophia' is wisdom. Epistemology, historiography and ontology confirm that universities were founded on human needs to survive and sustain fighting against adversaries like demons, rivals, animals, diseases, and calamities. Plato and his disciple Aristotle provided philosophical solutions to universal problems that made Alexander the Great a emperor who was a military general. Etymologically the word 'Academy' came from Greek hero Academus who saved Athens outwitting his adversaries. Strategy comes from Greek 'Strategia' - the generalship and art of handling troops in conflicts. Famous characters of Shakespeare and Tagore were either historical war heroes and/or victims. SunTzu, Koutilya, Cleopatra, Caesar,

Augustus, Machiavelli, Napoleon, Churchill and had polemologic relevance and were in front of university education. Tolstoy's War and Peace, a quasi-historic novel depicts Napoleonic era on Tsarist society. Emergence of UN was the consequence of war between the world's axis forces versus allied forces. The UNU at Tokyo is a polemologic research centre for world peace since 1973. One needs to study war and practice polemology for peace.

BUP as the Flagship Military University

The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman forecasted military's potentials of contributing to university education while addressing the Bangladesh Military Academy (BMA) gentleman cadets on 11 January 1975 at Cumilla, "InShaAllah, the days will come when not only South Asia but whole World will appreciate our quality of training and education." BUP is the flagship university among three (3) military public universities and four (4) military private universities. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University (BSMRMU), Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Aviation and Aerospace University (BSMRAAU) got established by BSMRMU Act 2013, and BSMRAAU Act 2019 respectively.

Bangladesh Army University of Science and Technology (BAUST) at Saidpur, Bangladesh Army University of Engineering and Technology (BAUET) at Natore, Bangladesh Army International University of Science and Technology (BAIUST) at Cumilla, Bangladesh Army University of Science and Technology (BAUST) at Khulna are four (4) military private universities established by Private Universities Act 2010. BUP affiliated institutes and colleges of Army Welfare Trust (AWT) are run through public-private partnerships (PPP) model. Two (2) Army Institutes of Business Administration (AIBAs) are at Savar, and Sylhet; five (5) Army Medical Colleges are at Chattogram, Cumilla, Bogura, Jashore, and Rangpur.

A significant number of centres, departments, colleges and institutes are as affiliated to BUP. The mission of BUP is to develop the civil and military human capital through advanced education and research to respond to the knowledge-based society of the contemporary world. The vision of BUP is to emerge as a leading university for both professionals and fresh students through need-based education and research equivalent to global. BUP has been manoeuvring to be nationally and internationally competitive for certification and employment and also to create conducive environment for research and development with the target to obtain high position in regional and global rankings.

Efforts for Enhancing Quality Education

BUP continuously is trying to explore quality education through partnership and exchange porgrammes nationally and internationally. Many of its students and teachers possess study experience of Australian Monash University which was named after General John Monash who fought in the Gallipoli campaign in WW-I. General Monash had also been the Vice Chancellor of Melbourne University (1923-1931). BUP signed a memorandum of understanding with Macquarie University which is named after British Major General Lachlan Macquarie who was responsible for colonial administration in New South Wales, Australia. Netaji Subhash University of Technology in New

Delhi holds the Motto "May lower levels of education. God bring holy thoughts to my mind from all directions" - BUP encourages all students for the same. Higher education demands andragogy and heutagogy unlike full-pedagogical approach followed in

These relate teaching and learning of peda- (child), andra- (adult) and heuta- (self). BUP as the flagship military university emphasizes on heuristics: an approach to solve problems by oneself discovering, inventing and innovating the various ways and means. Heuristics employs empirical methods and rational approaches, for reaching an immediate solution in order to research further.

BUP in Research, Innovation and Development

Promoting research is a continuous effort of BUP which entails systematic and creative work to increase the stock of knowledge. The word 'research' comes from French *'recherche,'* meaning to go about seeking for an answer to a question or a solution to a problem. The same is in rigorous practice among military and civil intellects as BUP R&D (Research and Development). R&D is a part and parcel of BUP education and practiced in all its organic and affiliated faculties, departments, centres, colleges, institutes, schools, and academies in line and staff organogram functions. Congenial learning environment ensures disciplining researchers' minds by mentor and mentee relationships in BUP.

Conclusion

Flagship is the command vehicle, ship or aircraft carrying a flag officer that leads others. The role of BUP as a flagship military university is significant nationally, regionally and globally for ensuring quality education. Epics by Valmiki, Vyasa, Homer, Hesiod and other polymaths on polemology are the sources of university subjects and disciplines ending with -logy, -gogy, -ics, -graphy, -ism, -gony, -sophy, etc. Epistemology identifies military affairs to be the root of all knowledge; thus BUP gets the flagship role in promoting life long and need based need learning and research. Fights against demons, rivals, animals, diseases, calamities gave gradual wisdom to Homo sapiens to survive and sustain.

BUP possesses an advantageous position to excel in higher education due to historiographical legacy, organizational strengths and disciplined systems. Latin *universitas magistrorum et scholarium* denotes a university that welcomes knowledge seekers of any vocation. SunTzu, Socrates, Koutilya, Alexander, Napoleon, etc. with military background paved the way for us to nurture higher education along with civilian intellects in BUP. Optimizations through need-basis civilianization and militarization, BUP will show the ways to all.

Role of Office of Public Relations, Information, and Publications for Global Branding of Bangladesh University of Professionals

Air Commodore Md. Mamunur Rashid
Chief
Public Relations, Information, and Publications

"Whoever Controls the Media, Controls the Mind" - Jim Morrison

Bangladesh University of Professionals (BUP) was founded as the 31st public university of Bangladesh. BUP started its maiden journey on 05th June 2008 at Mirpur Cantonment, Dhaka in the field of academics with the motto of 'EXCELLENCE THROUGH KNOWLEDGE'. Office of the Public Relations, Information, and Publications (PRI&P) is one of the important offices of BUP, started operating as Public Relations Office from January 2011. Since the beginning, this office also looks after University Archive in addition to its primary job. Through the versatility of its work, this office has created a wider publicity of BUP in the academic and research arena of Bangladesh. The PRI&P Office works as 'Spokesman' of BUP. It disseminates all kinds of BUP activities with the support of electronic and print medias. The PRI&P Office establishes and better maintains communicative relations with different media and concerned authorities. Members of the PRI&P office plays active role in advertisement, and broadcast BUP news in accordance with university authority.

Public Relations and its Domain

In 1807, Former US President Thomas Jefferson first coined the term "public relations" in his Congressional speech. Since then the PR has been working as a management function focused as "deliberate, planned and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public" that helps creating goodwill between the stakeholders. Its importance has been immense for creating favorable image for the organization, solving various problems due to disapproving stories, rumors, misinformation, and events.

In early days, newspaper, radio, television, drama, movie, leaflet etc. were known as means of media. But now a days the area and jurisdiction of media has increased significantly. Based on internet, now E-mail, Facebook, Tweeter, Blog, YouTube, Online News Portal etc. are predominating in media. Thus, it is reshaped in multifaceted dimensions like Print, Electronic, Online, and Social-Media. Traditional PR is generally used to define strategies that gain brand coverage in print, including newspapers, newsletter, magazines, as well as on traditional broadcasting channels such as TV, radio, and Digital PR. Again, it also included online marketing strategies to boost a brand's presence and visibility. Now, PR uses various means to conduct its activities in large scale to connect with

more people through multifarious tools. EPR is one such, that indicates internet-based PR activities such as E-mail, Facebook, Tweeter, Blog, YouTube, Online News Portal.

Presently, we are more prone to both fame and fabrication. Now, repression about anything is more impactful than earlier. In this context, the PR office deals with many sensitive issues through using various PR tools and techniques. It conducts several tasks including sending press release or rejoinder, arranging press conference, press briefing, seminar, dialogue and symposium on contemporary issue in home and abroad, making good relationship with media personnel, publishing various publications like newsletter, magazine, brochure, annual report, handouts, leaflet, monitoring media, building rapport with the people, projecting various issues to the society and so on. In global context, the PR office has been playing very crucial role and helping the concerned authority to achieve their goals.

The PRI&P office of BUP quite often continuously visits different media houses, institutions, and other universities to create good rapport. Glimpses of few such activities are given below.

Visit at UGC

Visit at Jahangirnagar University

Visit at ISPR

Visit at University of Dhaka

Visit at BRAC University

Greeting with officials at the Daily 'Desh Rupantor'

Visit at Bangabandhu Military Museum

Visit at United International University

Visit at North South University

Greeting with officials as the Daily 'Kaler Kontho'

Visit at Mass Communication and Journalism Dept. of Dhaka University

Visit at Public Relations office of Jahangirnagar University

Visit at National Archive and Library

Duties and Responsibilities of PRI&P Office

According to the Bangladesh Gazette (Registered Number D A-1) published on April 8th, 2009, from Bangladesh National Assembly, the duties and responsibility assigned to PRI&P Office of BUP are mentioned below:

1. Publish, print, and press release of different subjects related to university through proper authority
2. Print invitation letter to invited guests on symposium, seminar, and workshop
3. Take measures for wide coverage of all activities of the university according to policy
4. Arrange necessary press conference to provide information for people's interest
5. Prepare webpage

For media coverage of different kinds of meeting/seminar/symposium/workshop/top event/ convocation/display/games and sports competition/ cultural program, PRI&P office invites all electronic and print media and ensures presence of media personnel. It snaps still photography and record video, prepare banners/festoons and finally, prepare and publish press release on the important events of BUP ensuring wide electronic and print media coverage. Also, these event materials are preserved in media archive. This office also generates rejoinder, statement, explanation, comment, and corrections as appropriate, in relation to any published news of BUP in any media. PRI&P office scrutiny all news published in all the newspaper and place them to concerned authority. Press and publication division of PRI&P office does the followings:

1. Print question paper
2. Prepare answer paper
3. Print and publish research-oriented articles, books, journals, and magazines
4. Any other tasks assigned by Vice Chancellor

Other Tasks Conducted by PRI&P Office

Over the period, PRI&P Office also conduct additional tasks assigned by BUP Authority mentioned below:

1. Prepare and publish Annual Report (01 July to 30 June) of the university.
2. Prepare and publish Annual Report (01 January to 31 December) of the university for University Grants Commission of Bangladesh.
3. Prepare total statistical figure of the university (01 July to 30 June) for Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BA˙NBEIS).
4. Prepare and publish annual magazine of BUP namely Cadence once in a year.
5. Prepare and publish BUP Newsletter quarterly covering different events of BUP.
6. Prepare and publish two BUP Brochure, one for the Freshers (1st year Students) and the other for candidates interested to get admitted in BUP.
7. Prepare, print, and distribute BUP Diary, Desk, Tabletop, and Yearly calendar every year.
8. Preserve all broadcast/published events of BUP in electronic and print medias for future references.
9. Preserve all photographs of events in the BUP archive.
10. Upload subjects related to PRI&P office in BUP website and archive.
11. Maintain necessary communication with PR and other offices of public and private universities of Bangladesh.
12. Maintain necessary communication with all electronic and print medias of Bangladesh for positive branding and restricting negative publicity of BUP
13. Take necessary measures if any information received from social media which may tarnish the image of BUP in a negative way.
14. Publish all kind of notices in electronic and print medias regarding admission test of BUP for under-graduate and post-graduate programs including MPhil and PhD. The publications of PRI&P office are shown below.

Glimpses of Few Publications of PRI&P Office

Annual Report

Magazine

Newsletter

Central Brochure

Brochure for New Students

Supplementary

Wall Calendar

A4 Calendar

Desk Calendar

Professional Dairy

Staff Diary

Student Diary

Scope of Increasing Fields of PRI&P in BUP

With the approval of BUP authority, PRI&P office may appoint students from Mass Communication and Journalism department for electronic and print media as their representative to provide information regarding BUP activities in coordination with PRI&P office so that information of BUP can be published as news in most of the electronic and print medias.

Role of PRI&P in Improving National and International Ranking of BUP

BUP is striving hard to become a world class university and achieve international ranking. For that, this university is focusing on innovation in course curriculum, development of research-oriented work, publishing research-oriented journals, self-reliance, placement of alumni, and academic partnership with high-ranking international universities. Criteria on which the universities are ranked are given below:

1	Academic reputation	6	Student to faculty ratio
2	Graduation rates	7	Industry income
3	Research citations and papers published	8	Award winners
4	Internationality of faculty and students	9	Funding offered to students.[1]
5	Employer reputation		

As PRI&P office of BUP are well connected to public, information, and media; this office of BUP can play effective role in improving the national and international ranking of BUP. For that, BUP authority needs to involve PRI&P office in that endeavor. Meantime, BUP has signed MoU with following universities for better collaboration and cooperation on academic research, faculty, and student exchange program. BUP signed MoU with very fewer international universities in compared to other public and private universities of Bangladesh. As good number of North American Universities are having good international ranking, BUP needs to take initiative in academic partnership with North American, UK, European, and Asian Universities with good ranking. Departments, Faculties, and Centers of BUP may also take initiative for exchange curriculum with leading universities in their own fields. BRAC and North South University are well ahead in this regard.

TABLE 1: STATE OF MOU SIGNED WITH BUP WITH INTERNATIONAL UNIVERSITIES

SL No	Name of University	Country	Date MOU Signed	Expired Date of MOU
1.	University of Canberra	Australia	15-10-2019	14-10-2022
2	Macquarie University	Australia	11-10-2019	10-10-2024
3.	Western Sydney University	Australia	15-10-2019	14-10-2024
4.	University of Internal Business and Economics (UIBE)	China	18-08-2017	17-08-2022

BUP is very keen to sign MoU with good ranking international universities. BUP PRI&P office has already taken initiative in this endeavour. University of Winnipeg, Cranfield University, University of Lincoln, and Jawaharlal Nehru University have shown interest to sign MoU with BUP for academic partnership. The tentative fields under which MoU can be signed are mentioned below:

1. Provision of credit transfer of undergraduates and post-graduate students.
2. Student exchange program, both short-term and long-term.
3. Faculty development program.
4. Provision of faculty, student and staff exchange program based on mutual interest.
5. Exchange of information, academic curriculum, course materials, publications in fields of mutual interest.
6. Conduct of seminar, workshop, and symposium between the universities, involving faculties and students.
7. Explores research collaboration in the fields of mutual interest.
8. Provision of visiting fellowship for both the universities.
9. Exploring the provision of conferring joint and double degree if course curriculum permits.
10. Explore further academic and research program agreeable to both universities including new opportunities in future.

Conclusion

BUP is one of the leading universities of Bangladesh and the PRI&P office is trying its' best to project the achievements and activities of the university in a befitting manner in electronic, print, and online media. The PRI&P office is working hard in keeping continuous communication with different media homes for upholding the image of the university.

The university needs to have more academic partnership with well reputed international universities and have more curriculum exchange to improve under-grade and post-grade education curriculum. BUP needs to focus more on research-oriented curriculum and publications, so that innovation made by the researchers of this university become useful for all. This would help the university to improve her national and international ranking. PRI&P Office can also assist in improving the university ranking

using media and publications. For self-reliance, BUP may start planning to have press and photography studio and manpower are to be catered for that. PRIP Office can also assist in this initiative of the university. By 2024, PRIP Office must ensure recruiting total manpower of its establishment as number of jobs of this office has increased manifold. Proposal made in reviewing few posts in the establishment of PRIP Office may be considered seriously for effective operation of the office. PRIP Office of BUP is determined and striving hard in branding BUP as a global insignia in the field of education and all members of PRIP aspire to attend that dream through their excellence of effort.

References

1. Alam, M., 2014a. Public Relations. 1st Edn., Bangladesh Asiatic Society, Banglapedia, Dhaka
2. Ali and Roy (2012). Examining Perceptions about Public Relations: A Study among Communication Scholars and Public Relations Practitioners in Bangladesh.
3. Ministry of Education (MOE/SHA:18/B: U:PRO: -3/2008/196 Dated 05 June 2018
4. Muhia (2010). The Role of Public Relations in the Public Sector: A Comparative Analysis of Communication Strategies in the Ministry of Defence and the Police Department in Kenya.

Bangladesh University of Professionals (BUP): From Antiquity to Future-Setting Example from "Mujib Shotoborsho"

Brig Gen Abdullah Al Mamun
Registrar
Bangladesh University of Professionals (BUP)

Introduction

"TEAM BUP" is a broad concept of the ex-leadership, the respected Vice Chancellor (VC) who has a vast experience in administration and academic feat. The broad theme had been propagated after his joining on 31 December 2020. The author joined as Registrar on 02 February 2021 when the university was passing through a neo-normal situation due to COVID-19. It is worth mentioning that according to the **BUP Constitutions,** four appointments like the post of the VC, Pro-VC, Treasurer and the Registrar are made by the Chancellor and the Honourable President of Bangladesh (Bangladesh Gazette, 2009). It is also a matter of pride and the responsibility of those appointments to hold trust for the country like Bangladesh, let alone the university. Both the constitution that was passed the Parliament in 2009 and relevent university documents suggest that the Registrar is to support the respected VC in all administration and management related affairs. He is also the link between the Deans on broad academic issues where operational issues are dealt by the faculties. A strong bond among the team members encompassing the administrative branch and faculty members who move according to the direction and vision of the VC is necessary for any university. As the documents consulted and the history indicates, so far, no formal declaration and articulation of instruction and vision of previous VCs were revealed. Of course, well thought out policies, institutional vision, mission, objectives, and core values are available. Meticulous policies and guidelines with the change of the time and need are adequately available and those bear the testimony of the ancestors' contributions and toiling efforts. In the recent past, after sixth month of his joining the respected VC, BUP delineates a philosophical, yet clear instruction and vision for the team members as under:

Figure 1: A Philosophical Vision/Instruction of Respected VC and a Symbolic Issue of Relay Race

The relay race issue of Beijing Olympic 2008 is symbolic to the instruction of the ex-VC, BUP. In the relay race contribution of all team members are equally important. The team of Usain Bolt, world's fastest' s runner won the gold medal in 2008. After an investigation later found that due to one of the team-members (Nesta Carter) took illegal drug in that meet. Finally, the International Olympic Committee endorsed that for doping of Carter the team lost their gold medals for **the Men's 4 × 100 m Relay** on 25 January 2017. Here lies the equal spirit of the team members.

"TEAM BUP" is unique due to its purpose where serving armed forces personnel, a few are from the retired personnel and majority is from the civil society. Personnel from the civil society are employed both as faculty members and the staff whereas military personnel mostly provide leadership and administer/manage the events of the university. Like BUP, armed forces personnel involved in schools and colleges are performing splendid job and contributing to the national education system. However, to achieve the mission of creating knowledge-based society of the contemporary world, BUP needs to work more. Moreover, the vision of attaining the need-based education and research with global perspective is vast and we all need to embark on.

It is worth mentioning that since 17 March 2020, all government, public and private institutions are formally reckoning the philosophy of the father of the nation of Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The noble project held the banner **"Mujib Shotoborso"** and it continued up to 16 December 2021.

In the world rankings, the position of universities of Bangladesh is not encouraging. There is a trend of studying abroad by the youngsters in foreign universities due to the future job security and quality education. It happens mostly amongst the siblings of the affluent, educated and enlightened families. Even the same of the middle and higher-middle class societies including the policymakers and bureaucrats are on the rush for education abroad. The cumulative effect of such trend is multifaceted not only remains in education sectors, but also it impacts radially. Afore mentioned impacts on good governance, sectoral transparency, cost-benefits issues of the people's money, future generations development etc. Again, some quality education exists in and around Dhaka and in some major cities where unveiling of facts also becomes a sensitive issue. BUP has some potentials to set example and take the lead role. Because some administration, management and leadership role are taken care of by the armed forces personnel who has outstanding contributions in the education of secondary and the higher secondary levels. Their contributions are also enormous in Cadet Colleges and Collegiate and Public Schools and Colleges and those are the prime feeder institutions for officers of the armed forces and motivated citizens in other disciplines. However, some of the members of the armed forces may not have previous exposure in education sectors that may take out sometimes for adjustment in both physical and metaphysical domains (https://en.wikipedia.org. 2021). A well thought out plan for orientation may contribute to BUP. Similar realities persist with the teachers and other civilian staff for acting like professionals as the institution demands. Though, most of the armed forces members have the vast experience in United Nations (UN) where Bangladesh had been ranking the top, yet teamwork with faculty members and the civilian staff needs a fine tuning. Here is the need for research.

---

[1] Metaphysics according to the Wikipedia **"questions about the nature of consciousness and the relationship between mind and matter."**

Aim

To highlight the past (antiquity), present profile of BUP and future goals/aspirations taking the philosophy of Bangabandhu from **"Mujib Shotoborsho".**

BUP at Antiquity

BUP was established on 05 June 2008. Initially it was aimed to handle the professional courses of affiliated armed forces institutions only. The planning and foundation were laid at the end of 90s (1996-98) in the heart of the Mirpur Cantonment, where a military unit was planned to rise. It was one of the heart-breaking events for the soldiers who had to finally station at Rajendrapur Cantonment. Again, they became quickly optimistic when they learned that Mirpur would turn into an **"Education Village"** where siblings of armed forces personnel would be able to receive quality education from the foreseen institutions. It was the most appropriate and inspiring news to the officers and men who had been engaged in Counter Insurgency Operations (CIO) at Chottogram Hill Tracts (CHT). It is worth mentioning that at that time at CHT, around forty units were deployed. Many were heli-supported and good/bad news of siblings took sometimes a month to reach them. Such issues were not discernable to most of the citizens of Bangladesh.

Routine office work of BUP commenced in the old building of Military Institute of Science and Technology (MIST) with a few senior officers (like Brigadier General Syed Mofazzel Mawla, retired) from both Bangladesh Army and the civilian cadres. At that time very limited resources were shared with MIST; jobs were enormous, multidimensional, and new. Reportedly, many a times they had to coordinate and tune some issues under mango trees due to non-availability of a conference place proper. Later on, with the passage of time, the university campus was shifted to the present location.

Philosophy of Bangabandhu Pertinent for BUP

After the independence Bangabandhu envisioned by saying, **"no investment could be better than investment in education"**. He felt that education system should not be confined to rhetoric, rather the focus should be the serving the people of Bangladesh. Accordingly, he, being its head formed Dr. Qudrat-e-Khuda Commission in July 1972. Finally on 30 May 1974, the Commission submitted the report where he emphasized on teaching and research in universities. Bangabandhu established University Grants Commission (UGC) over an ordinance to quicken teaching and research in addition to monitor the fundings to the universities.

Bangabandhu opined those goals of education is not only to seeking job but also to using it as a tool of service and development at large. History testifies that even at the prison Bangabadhu used to read as truth seeker and as part of recreation too. He, by keenly observing the issues of any country used to develop his own concepts. After independence through the above-mentioned commission, he wanted to establish public universities at all districts of Bangladesh. His prudent daughter and Honourable Prime Minister (HPM) of Bangladesh is also working on it relentlessly. On the contrary, educational institutions are yet to ensure the quality education. Bangabandhu's philosophy on education clearly instructs to pursue courage, honesty, sacrifice and farming pro-people notion in all educational institutions, specially the universities those would produce the national

assets. During his lifetime, he addressed the following philosophy (expressed symbolically) to build an educated, capable and dignified country Bangladesh:

Figure 2: Symbolic Comments/Guidelines of Bangabandhu Pertinent to Basic Learning in the Educational Institutions

BUP's Future; Expectations and Goals/Objectives-A Few Suggestions

No doubt, within a decade, BUP has come up well, yet the institution has much to accomplish for its betterment in terms of aspirations, goals and objectives. The rooms of improvement ranges from the basic issues to the new ideas. As regards to some basic issues, BUP first to stand with institutional distinctiveness not as the personalized one.

BUP aims to reach the global height and set example in Bangladesh. One of the plausible reasons of such aspiration is that members of the Bangladesh Armed Forces are continuously ranking the top in UN. If UN today evaluate any country through discipline, attitude towards women and children, Bangladesh will secure the top position. At BUP, gender equality persists, yet it is short of the UN standard as achieved by Bangladeshi troops.

Figure 3: A Symbolic Picture of the Armed Forces Members and the Future BUP

[2] https://www.aljazeera.com/news/2021/8/8/sexism-is-still-a-problem-at-the-first-gender-equal-olympics

Above issues are symbolic and far reaching. However, the spirit must go in consonance with the institutional dress-code, Bangladeshi culture, tradition and own religious understanding through secular lenses.

5. Concluding Remarks

The purpose of establishing BUP was mainly to support the education of the affiliated institution of the armed forces personnel. The then military leadership envisioned that in the **"Education Village"** of Mirpur, siblings of military personnel would be housed who used to work in far-flung areas, especially in CHT. Contributions of our ancestors was enormous for the development of BUP. Yet, to continue with the improvement and setting example in education sectors, BUP needs to work on the following issues:

a. Good practices those have taken off due to the working philosophy of the respected VCs must be formalized, endorsed and kept recorded as policies/books. All university issues must be institutionalized, not to be personalized.

b. The people of Bangladesh are yet to conceptualize the philosophy of our great leader -Bangabandhu in education sector. "A Startup Concept" with Bangabandhu's philosophy, direction and guidelines on education, administration and even leadership may work well. BUP has all the potentials to act as harbinger and others may also take the relevant part from it. We all should do it both for the training and motivation of teachers and students at large.

Figure 4: Some Motivational Slides of "Mujib Shotoborsho"

If we can do it, it will be our asset-not the property which is temporary. **LET US HOPE FOR THE BEST.**

Fight The Fatigue

Group Captain A K M Ziaul Haque
Director
BA/BSS Program

Introduction

It is 0700 hrs, your alarm is ringing loudly. Your class will commence from 0800hrs, you need to get up and get yourself prepared for the class. But you don't want to get out of your bed, and once you finally get up, but you can't find the energy to do your morning workout and shower. You have an important class at 0800 and followed by a presentation at 1000hrs. So, you drag yourself to get freshen up and at last reach BUP. But during the class you lack the ability to concentrate on the class lecture. This is the indication that you are fatigue.

Pen Picture of Fatigue

Fatigue is described as an overall feeling of exhaustion or lack of strength or energy. It is not same as simply feeling drowsy or sleepy. When someone is fatigued, he/she has no enthusiasm and no energy. Drowsiness may be a symptom of fatigue, but it's not the same thing. Fatigue is a common symptom of many medical conditions that range in severity from mild to serious. It's also a natural result of some lifestyle choices, such as lack of workout or poor eating habits. If your fatigue doesn't resolve with proper rest and diet, or you suspect it's caused by an underlying physical or mental health condition, see your doctor. Doctors will help diagnose the cause of your fatigue and work with you to treat it.

Often fatigue is a normal response to things such as stress, a change in sleep patterns or a heavy workload, and for students it could be assignments, exams etc. Doctors suggest giving yourself more rest than usual at these times to restore energy levels. But here is a tricky part; although fatigue can often be resolved with more rest and lifestyle changes, it can also be a symptom of something more serious. Many doctors said, people visit the doctors when they notice any other physical changes along with feeling tired or if their fatigue persists for more than two weeks even after making lifestyle changes. Now let us try to find out the causes of fatigue.

Causes of Fatigue

Many conditions, disorders, medications and lifestyle factors can result into fatigue. Fatigue can be temporary, or it can be a chronic condition (when continuing for six months or more). You may be able to release from this situation by changing diet, treatments, physical exercise or sleep habits. If an underlying medical condition causes fatigue, doctors can usually treat the condition or help you manage it. Causes of fatigue include:

Poor Lifestyle Habits: Poor diet, drug use, too much stress and an inactive lifestyle can all be the cause of fatigue. For frequent travelers "jet lag" generally causes short-term fatigue (symptoms usually improve in a few days).

Medical Situations: Fatigue can be a symptom of a wide range of illnesses, disorders and weaknesses affecting various parts of the body.

Lack of Sleep: Insomnia, sleep lessness, and narcolepsy can result in severe tiredness and long-term fatigue.

Medications: Few medicines, including antihistamines and blood pressure medications, can cause fatigue. Fatigue is also a common side effect of bone marrow transplants, chemotherapy and treatments for a range of conditions.

When speaking to a doctor, describing your experience of exhaustion in detail its essential for helping him/her to identify an underlying cause. Although fatigue is generally defined as a lack of energy or motivation, this can manifest physically, mentally or both. Some question you can ask yourself, like

a. Do you not feel refreshed even after a long night's rest?
b. Do you find it hard to focus on classes or projects?
c. Do you tire too quickly when physically active?

If the answer to any question is "Yes" then please be informed that you are fatigue.
Fatigue that comes on suddenly, persists and is associated with unexpected weight loss or night sweats may be a red flag for something very serious like cancer. In that case, please don't delay seeing a doctor.

Naturally, the quality and quantity of sleep you are getting should be considered. Poor sleep hygiene- like spending excessive time in social media at night, chatting, watching videos at late night can disturb your rest. Sleep apnea is another common culprit; those with this condition stop breathing for at least 10 seconds at a time during their sleep.

Any amount of drug can worsen your sleep, but the more you consume, the greater its effectiveness. While drugs may help you fall asleep, it interrupts circadian rhythms and thus is an obstacle to proper rest. When the fatigue become chronic, there is no specific diagnoses to find it out, it's all about realizing by the individual. But the condition is defined as prolong and profound fatigue that hangs around for at least 6 months.

Fighting Fatigue

Several actions can help to reduce fatigue caused by daily activities. In order to boost your energy levels and improve general health you should follow the following habits or practices:

a. Drink more water to remain hydrated.
b. Develop healthy eating habits and avoid too much of junk foods.
c. Some bit of routine physical exercise.
d. Have adequate sleep and avoid spending time in internet at late night.
e. Avoid those people who normally gives you stress.
f. Steer clear of a work or social schedule which is highly demanding.
g. Participate in relaxing activities, such as yoga.
h. Stay away from alcohol, tobacco, and all other illicit drugs.
i. Finally, spend more time with your family members and always remember your mother is your best friend.

I am not saying that these lifestyle changes will save you from fatigue but will definitely help a lot. Healthy lifestyle, happy and quality time with family members is always a bonus point for any person. Having really caring and understanding friends, who will not keep you awaken till late night is the desirable company you should look for.

An Unknown Tune

Niha Nahiun Chowdhury
Student
Department of English

I feel my soul dancing
To a beat unknown.
I ask it for its source.
From where you come?
From where you play your song
That feels so like home,
That pulls the most melodious strings of my heart,
That vibrates through me,
Making me dance to it?
It drives away the chaos.
It ingulfs me into its tune.
From where you come?

Do you come from the rain drops
That fall from high above,
That make the cloud play with the ground,
That linger on the leaves and grasses like a crown?

Do you come from the wind
That makes the flowers sway with joy,
That creates wave in the grass,
That showers the ground with fallen leaves,
That shakes the tree tops
And touches my face
And makes my hair dance?

Do you come from the ocean wave
That brings for the shore
Its love from the deepest of its core,
That brings hundreds of seashells?

Do you come from the night sky
With its thousands glittering stars
Or its lonely moon
That ingulfs the world with
Its beautiful silver tune?

Or do you come from an unknown place
That I have yet to discover?
From wherever you come
And wherever you hide
I will follow your sound
And find you out.

Walking in Dhaka City

Rifa Tasnia
Student
Department of English

From a 14-storeyed building's rooftop terrace, a celestial godlike kingdom for the spectator is unveiled in Dhaka city. With minuscule people wandering around, tiny CNGs rapidly moving to their destinations, ant-like vehicles stuck in traffic, and too many adjacent buildings, the polluted landscape of Dhaka city holds a new dimension for the observer on the terrace. The observer stands over everyone and everything like a sovereign and stands apart from the rest of the city, separate from all of its sorrows and adversities. The view from above reduces everyone and everything to mere objects, existing just to be viewed.

Enclosed within the boundaries of walls, the city observed from a topside view becomes an idea rather than reality. The sounds of a bustling city are silenced by the harsh winds on a terrace, becoming a kingdom barren of life. The city's existence is eradicated without the senses fueling each moment in life. The haggling of customers, the tinkling of rickshaws' bells, the horns of vehicles, the chanting of beggars, the pandemonium of traffic, and the rapid pace of commuters are white noises from the confined space above Dhaka city.

Standing below, however, offers a different sight. This is the view that transforms the spectator into one with the masses. The observer is now someone who is no different from anyone going about their day-to-day life, not just overlooking a sea of people, vehicles, and buildings. It is similar to an Icarian fall that forces the spectator to leave a confined space to take their place among mortals. Down below, the real Dhaka city is discovered. A city comprised of walkers - the true inhabitants of the city.

The walkers navigate the streets sullied by detritus to create their spatial stories. Only they have the power to change Dhaka city from an empty place into a lived space through taking shortcuts, exploring, and encountering other walkers just like them. Their movements adopt a symphony distinct from the mayhem of thousands of footsteps existing in the city. This is how each step of the walker molds the city into its own visage, a visage that reflects the city's liminal space. This liminality is a privilege for only some walkers as it is a permanent reminder for many of lacking a place within the city. Dhaka city is, therefore, defined by the everyday experiences of those below because its pedestrians, commuters, and passersby ultimately shape the city.

Reference

Certeau, M. de. The Practice of Everyday Life (S. F. Rendall, Trans.; 3rd ed.). University of California Press.

Hollowness

Ashrafun Naher Aananna
Student
Department of Public Administration

We feel horrible.
No! We feel nothing.....
It's like we are stuck in a place there is no one except sheer silence. Dead Silence.
It's suffocating.
It makes me realize, when they leave in a coffin to be buried, how they feel.
It takes their breath away. They might have felt agony being in dark.
They are alone!
That's how we feel when someone really close gets lost in time. Their time gets stopped.
Eyes Closed. Stopped Breathing. No beatings of the heart. No pulse. Just frozen.
So cruel.
We stand there and see the soul slip away in the air and vanish. Nothing seems to exist then. Time for a moment gets halted.
Just silent cry breaks out.
Everything breaks apart. Emotions get numbed. The feeling of our existence seems valueless.
The heart plays with the mind. Mind gets deaf. Heart opens the hollowness, we feel inside.
It's a hole of darkness....
There start opening the old stored memories and the mind starts to play. That's the time turmoil gets started inside of us.
We cry out and called to those moments of old pages to live again. But we forget, old and torn pages sometimes get so ruined they can't be repaired.
Somethings are mean to be the old pages.
Humans are rare species when it comes to emotions. Everyone functions in different ways. Some do feel and some ignore. Some cry in silence and some cry their heart out.
Time starts again. Illusion turns out to be reality. Mind starts to get back to the place.
But heart....
It never changes. It still hurts. It still gets haunted by past memories.
Want to chase them away. Don't be stupid. It just doesn't go away. We seem to accept it. Time plays its card.
Days go away...running....
Though in the back of our mind we still hold them close. We might have stopped crying but hollowness stays there.

It's never going to get faded. There will always be a sheer silence which was once used to be filled with pure bliss.

A never ending silence...

But we never push them back. We only get into our routine. No changes. The change is just the demise of a beloved.

Is it true that nothing changes? Wrong! Cause even there are no changes but we change. Our life changes.

Cruel laughs we laugh!

Chuckling with a bitter sense where heartfelt mourning stays fresh as new green leafs of spring forever. These feelings never get old. It pours as rain drops, wetting us with tears of bitter truth.

Sweet memories stay..

We are not void of getting rid of sadness. It comes naturally. It comes through reality. It comes as a strong wind of bad weather which we can't ignore.

We are bound to feel it. We can't let them go. It will still come running as the waves of the ocean. We don't have the ability to push them back. As it comes to surface and it will also go back.

And It will come again. There is no meaning of running away from this. It will play it's role.

Pathetic!

Emotions, memories and never ending words of beloved ones will remain in our memories. We may get involved in our daily life but nothing changes. These are the ones we can't forget even by mistake. They exist in every corner of our own cocoon.

Never gone.

When we open our eyes in the morning that's the time we feel that unwanted emptiness.

We feel then that we don't hear the voice anymore calling us out.

We never feel the same joy to share our meal with anyone.

We never see the person to have a heartfelt talk.

We don't see the person on a rainy day sharing a cup of milk tea enjoying the blissful silence.

Sometimes melody playing in the back and we were laughing and playing games.

There is everywhere we live, exists the hollowness of a lost person.

Beloved. A Family!

We do move on but this emptiness stays. We never forget them. We just make new memories so those old pages of memories get pushed back to a corner of our mind.

Taking a small place for ever.

We can never fill those hollowness that is filled with felicity and sadness. Cause this makes us strong and this gives us learning of life. It makes us brave enough to overcome everything every time.

We learn a life lesson.

But every time getting hurt!

Perhaps this is how we feel when our heart bleeds invisibly. We feel numb. Our eyes sting as hot tears fill them. But we feel blank. Nothing!

Fates laugh. Too Ironic. We also laugh at our fates.

In the end, Hollowness Remains!

When Women Ruled the World

Major Tanvir Hossain
Assistant Professor
Office of Evaluation, Faculty and Curriculum Development

The world is basically a Patriarchal Society. Human history reveals that the world and the society are mostly dominated by men. History hails men as Conqueror. Women, child and feeble were the partners or relatives of the conqueror. From ancient time to modern metropolises everywhere men made history, earned name and fame. Rest of the clan saw history in the making. This is the traditional narrative of the history books.

Female rulers are rare phenomenon in the ancient history. But, history also reveals that a thousand years ago in ancient Egypt there were six women who ruled Egypt, the Nile River and its people as female Pharaohs. Actually they ruled quite a big part of the ancient world and controlled totalitarian state as power broker and rulers. Each of them ruled with power and cemented their position in the history. Although they were not mentioned explicitly in the history, but they reigned over ancient Egypt and its surrounding areas. Not only they became supreme ruler but they were also famous and powerful during their reigning period. History knew them as six remarkable female pharaohs, from Merneith, Hatshepsut, Nefertiti, Tawosret, Cleopetra and up to Neferusobek. Together their story created a mighty epic that ends in tragedy. It is the saddest part of the history. It is not because they failed in statesmanship or diplomacy rather, some of them were extraordinarily successful and lead dynasty but, they were expunged from written and visual history after their death. The subsequent male pharaohs tried to rewrite history by removing the female Pharaohs good deeds and remarkable achievements. But the dominant male Pharaohs could not hide the female Pharaohs from history pages as their reminiscence existed even after their death. All the female Pharaohs and their footprints were found buried beneath the earth in Egypt. When the modern archeologists found those artifacts, the golden history of those female Pharaohs were revealed to the world.

Picture of Six female Pharaohs of Egypt.

Merneith

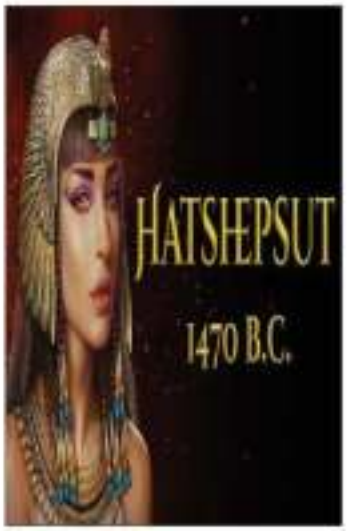

Hatshepsut

Nefertiti

Tawosret

Cleopetra

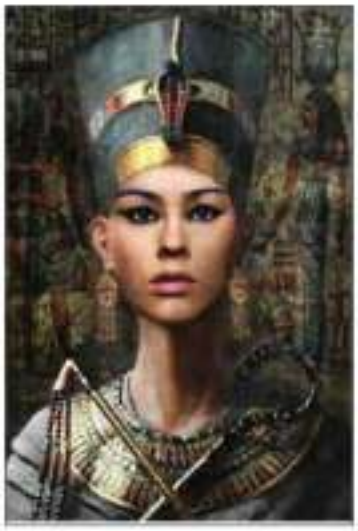

Neferusobek

Same happened to Nur Jahan, the wife of the Mughal Emperor Jahangir and step mother of the next Emperor Shah Jahan. During her pinnacle, she became an Empress and ruled with power and dignity within the territory of the Mughal Empire. Even Shah Jahan, son of the Emperor Jahangir tried to remove her footprints from the history but in vain. Although we remember Shah Jahan as the great builder of Taj Mahal, but in reality, Shah Jahan got inspired for the idea of Taj Mahal from the original design of the monument that Nur Jahan built in memory of her father. But history remembers mighty ruler Shah Jahan more than the actual genius (Nur Jahan) who was a great architect during that era.

Picture: Mughal Empress Nur Jahan

Today from Argentina to Uganda, India to New Zealand, Bangladesh to Moldova total 63 countries have seen women occupying the highest position of executive power. The Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina has topped the list by holding maximum duration that is 18 years in the highest position of a state. Current world leader USA is yet to elect its first female President. I forecast that Senator Kamala Harris may become the first US Senator to break the glass ceiling. (Glass ceiling means an unacknowledged barrier to advancement in a profession, especially affecting women and members of minorities).

Yet if my prediction becomes reality, then she might be seen as the phenomenon called the glass cliff and only time can say what's going to happen. (Glass cliff means women empowerment during crisis times). This article is dedicated to all the mothers of the world (Both Biological and non- Biological mothers).

Reference:

1. Kara Cooney (2018), "When Women Ruled the World: Six Queens of Egypt".
2. Ruby Lal (2018), "Empress: The Astonishing Reign of Nur Jahan."

Compulsion of Will

Jannateen Naoar Siena
Student
Department of Public Administration

In a world full of secrecy,
Life is just about travelling from -
One stage to another,
Till its end; called - 'The Death!'

Each valley is different.
Hard, Harder to Complex.
One needs to pass the hurdles,
Breaking all the obstacles with -
'Hard Work & Patience.'

Not everyone is lucky enough to touch the peak,
As per the desire that would be!
Where -
'Comparison' exists,
'Support' is lost,
'Encouragement' is disappeared.
'Confidence' lacks,
Breaks the 'Courage',
Drives us other ways.
Frustration surrounds &
Despondency kills the 'Hope',
Locking our aims to the -
'Paragraphs pages!'

The clock is ticking,
The days are passing,
But desperate eyes are still dreaming -
To have wings to fly -
Over the Land,
Over the See,
Over the Sky,
of that one & only -
" Blue Paradise. "

The Economic impact of Covid-19 on the Agricultural Sector in Bangladesh: Focus on Supply Chain Disruption

Mohammed Shariar Hossain
Student
Department of Economics

Introduction

Agriculture is one of the base of Bangladesh economy. Millions of people depends on this sector. More than 14% of GDP comes from this sector. As like other sector, Global Pandemic also hit hardly on this sector. Transportations and supply chain has disrupted badly. Farmers faced huge loses as they cannot sale their products in market places within time. Lockdown in most areas made markets more challengeable to reach market equilibrium though demand fell rapidly. Although govt. declared different schemes for farmers and other small businessman to support them. But this not enough, long term effective policies need to recover the loses of agricultural sector during Pandemic.

Agriculture and Bangladesh Economy

Bangladesh is an agro-based country. Our soil and environment is helpful for producing agriculture products. Our food security totally depends on the production of agricultural products. Agriculture grab a significant portion of GDP. We also export different agro-based products in different countries. But a number of natural disasters like sudden floods, drought etc hampered our agricultural production. These causes losses of huge amount of agricultural products impacted negatively our economy. These disasters create shortage of foods and increase price of Argo-products.

Figure: Bangladesh Agriculture at a glance

As a consequence, the government needs to import rice, wheat and other food items from foreign countries to meet the demand of people. In this 21st century Bangladesh has improved much more its agriculture sector. Now, farmers can cultivate more lands with scientific methods, this method increase the capability of production. Now, wmen and men works on shoulder to shoulder to increase production and working capacity. Especially, non-rice crops and vegetable production hugely done by rural women which help them to support their family financially and balance diet. Now, our country become more negatively capable to produce agro-products efficiently. But the sudden spread of pandemic Covid 19 have impacted on both agriculture and economy which need adequate time to address situations.

Source: Bangladesh ministry of Agriculture, food and Agricultural Organization

Covid-19 Impact on the Agricultural Sector

Covid-19 badly hit our agriculture sector. Production, transportation, export-import all are impacted by Covid-19 pandemic. Because of unavailability of transport most of time products not reached in markets within delivery time. This external restriction also created supply disruption in the markets which created more challenges. So, the price of different products did increase which pressurized the market equilibrium. Many labours who are engaged in harvesting process of crops could not move to harvested area, because of pandemic. As a cosequence, these labours pass their daily life in very hardship and can't earn money. As farmers can't hire labors during pandemic; they cannot cut crops in right time. So, sudden floods or heavy rainfall can damage their matured crops. Although govt. are trying to support our farmers. Ripper machine, auto cutter machine and other necessary equipment provided to remote areas farmers to cut their matured crops within short time. These machines help them to cut their crops easily and quickly with very low cost. But proper distribution of products, maintain supply side uninterrupted is a big challenge. Especially in this pandemic periods challenges become tougher.

Price Change of Agricultural Product During Covid-19: This supply disruption created different problems. Some products price increases especially import items of agriculture products.

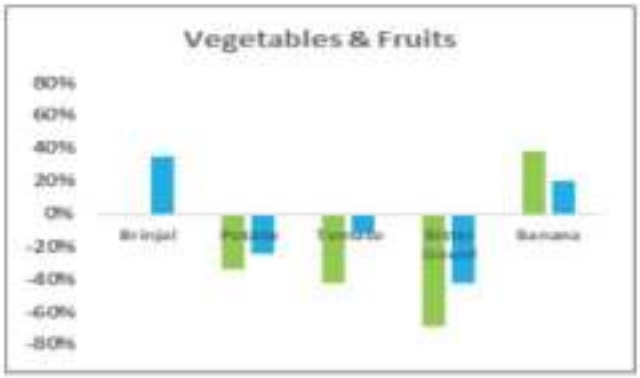

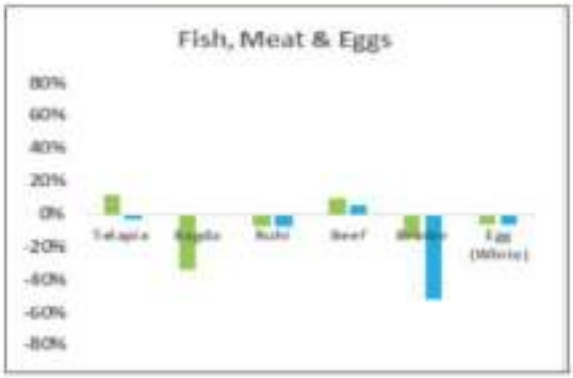

Source: www.fao.org

On the other hand, products produced by farmers, were unable to get fair based lands price fall highly. Farmers not even get their production cost as they sold products very low price. The poultry sector is taking a unequal hit during the Covid-19 crisis due to widespread believes that the Covid-19 virus is transmitted through poultry products which is not true. Different research said that in Dhaka city markets prices have dropped for eggs (-1.8%), broilers (-45%), day-old layer chicks (-7.5%) and day-old broiler chicks (-90%), with about 50% of eggs and 70% of broilers unsold at different farms of our country (Source: Survey of Dhaka cities commodity price change as purchased by the poor (FAO).

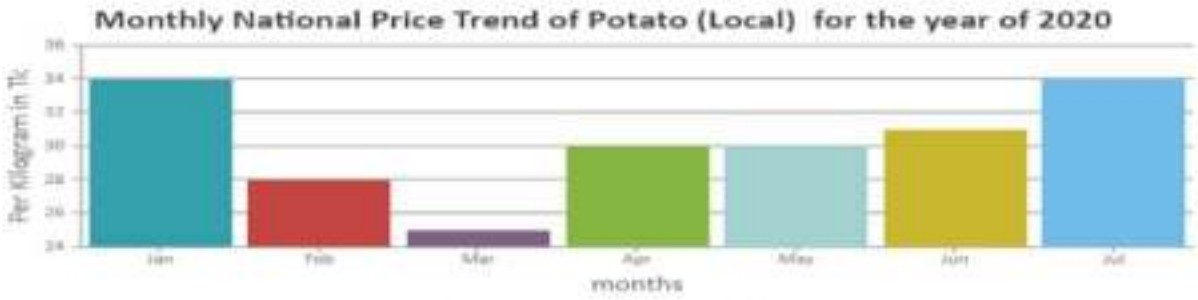

Source: www.dam.gov.bd

During the Covid-19 lockdown period, the prices raised high. But after lockdown supply of products increased but price fall of many important grown products. Especially potato, tomato, vegetable and other perishable items. Non-leafy vegetables are being sold at a quarter of their normal price by farmers. Lao (bottle gourd), local potato, cabbage, local tomatoes, bitter gourd and spinach price have dropped. Farmers are selling vegetables at 25-50% of production costs because of low demand and transport problems (Source: The Financial Express, 18 April 2020). As export-import stopped for few weeks; most import items faced supply shortage, especially onion, ginger and other imported items. Farmer also faced problem with quick rotten vegetables because they get low price and faced smooth transportation problem; they couldn't sold their whole products in market due to unavailability of transportation faclities.

Table: Some Food Price Changes 12 March-14 April 2020.

Type	Commodity	Unit	Market Price (12 March)	Market Price (14 April)	% Change in One Month
Cereal	Rice Boro-Coarse	Kg	31	41	32.3%
Cereal	Aman-HYV-Coarse	Kg	28	34	21.4%
Cereal	Aus-HYV-Coarse	Kg	30	40	33.3%
Vegetables	Cabbage	pc	14	9	-35.7%
Vegetables	Lady's Finger (Okra)	Kg	53	19	-64.2%
Vegetables	Tomato	Kg	28	16	-42.9%

Source: Department of Agriculture Marketing

Conclusion

Agriculture sector is one of the significant sector of our economy. Food security, food availability, food supply chain all includes in agriculture sector. But the Corona virus badly impacted on the agriculture sector, especially the supply chain and value chain countrywide. Therefore, pragmatic different policies needed to save our agricultural sector. Supply chain need uninturrupted to ensure availability of foods to feed millions and population. As this is a long and continuous uncertainty and insecured; so effective long term policies need to recover our agriculture sector and economy. And we hope that within several years we can regain and develop our agriculture sector more efficiently.

References:

1. Rapid assessment of food and nutrition security in the context of COVID-19 in Bangladesh (May, 2020);www.fao.un.org/fao_bangladesh_covid-19_rapid_assesment_report_09-05-2020_final13may2020.
2." Vegetable growers in dire straits" The Financial Express, 18 April 2020
3. www.dam.gov.bd

A Tale of a Coffin

Muhammad Nurul Islam
Assistant Professor
Department of English

Four angels have arrived, encircled a coffin
One says, look inside, a blood-stained bright outfit
Now has turned into a flower
And like a Bakul eyes are sad in tears!

Four angels have arrived, encircled a corpse
One says, there is doubt inside,
He is not here anymore as he was before
For he's blooming like a map of earth for sure!

Four angels have arrived, encircled a human body
One says, look inside, how calm (it is)
Not a corpse, nor a human body
Here lies the country, the spring of all rivers into this heart!

Four angels have arrived, encircled a coffin
One says, look inside, the fingers of young hands
Like a Rakta karabi, a blood-stained chest
Holds to the whole, the picture of country!

Note: Original poem named **কফিন কাহিনী** written by Mahadeb Saha
Translated by Muhammad Nurul Islam

Discovery of Death

Raufur Rahman
Student
Department of Business Administration in Management Studies

I was never afraid of death.
Not when bullets were flying right before me,
Not when a plane crashed on the building that I was in,
Or when a truck killed 82 on the spot.

I was not afraid.
I was fearless, sure of prevailing all odds.
I was a sharp blade, that never needed honing.
The thought of death, was surely not for me.

But everything changed today,
Today, when I saw a man crying for justice holding a lamp post;
For the first time ever, I felt, I felt like a ghost.
When I witnessed the never-ending gap between the rich and the poor;
Truly I felt, I felt like locking myself behind a door.

Finally I realized, realized that I'm dying.
The process is slow, but sure to come.
A hard but inevitable realization for me.

Who am I among all the vanity?
I am 'Humanity'.

WHAT DO WE OWE EACH OTHER?

Shahrukh Khan Akash
Student
Department of Law

A question might come into our mind often that what is it we really owe to each other? why does generosity matter? Maybe not to our family members but before being generous to a complete stranger a logical question can come to our mind about why should we be generous to that person.

As human being we have been living in a society for a pretty long time now, we have formed family and developed norms to control ourselves but are those the only sources of connection among us? If delivered in simple words the answer would be no, the connection we have with each other goes far beyond that.

The journey we are having as a living species is a special one, but in this journey we owe a lot to our surroundings. With the contribution of material things earth has formed in a way that it could contain life. The sun, the whole solar system performed in a certain way that ensures structured life form in this little planet. We might take those facts for granted but denial of the importance of every such incidents would be a denial to our identity. Every phenomenon has a little contribution to our existence and we are not certain that whether we would be there if anything happened differently as currently we see no other planets with even simple life form in whole known universe.

We are special, and those factors hold a part in it regardless of the fact how it all started.

As the planet held the necessary components, life in it started and plants found a way to evolve. Thus based on plants complex creatures like us are breathing today. We are constantly using the resources from our beloved planet everyday, and usually we forget the sense of giving thanks and the things in return planet requires from us. Cautious and thoughtful use of resources can be start of us showing necessary gratitude towards the planet to help it grow just like it is growing beautifully since the day one of its journey. Compassion towards other living creatures is necessary. We have to remember that they exist thus we exist. So, we are not alone, every creation has a part in our fabulous journey.

It would only be sensible saying that they are also part of us, all that are seen and experienced, living or otherwise. The flow of our collective consciousness is something that helped us grow and helped us reach this far. Naturally we are dependent on each other, together we grow. Knowingly or unknowingly without the help of each other we cease to exist. It is true for our relationship with each other as human

being also it is true for our relationship with other creatures as well. Everything is part of everything, our journey tells us that. To continue this journey we need each other, to grow, to be there, to see the future together. When we see ourselves collectively and accept our togetherness, it leads us to the conclusion where it becomes our duty to love each other, be compassionate and helpful. Because as we can not be harsh to ourselves we should not be harsh towards the things and beings related to us. We should love everything that is part of us, part of our journey, just as we do love ourselves. Otherwise our growth will be hindered.

So, this special connection among creations is something that we owe to each other, the need of togetherness to grow is something that we owe each other.

In recent times people are so obsessed with earthly phenomena that we ourselves created not so long ago making us forget about our primal selves. We tend to forget the true connection among us and play around with the little things we have created. This obsessive, money driven, selfish mentality in the society that we have established is damaging us from deep inside. Depression and suicidal tendencies among the population is increasing everyday. But there is a solution towards that as well, we have to acknowledge our primal connection and be compassionate to each other. Compassion towards others reduces stress, anxiety and can eventually make depression go away as we naturally feel good after helping others. People know all this, but being so busy with only ourselves we are losing the practice of being generous which is clearly causing unhappiness among population. So, it can be said that for the sake of ourselves, our happiness, we certainly do owe each other, a lot.

We have to remember that, for love it is only love we get in return, one or two earthly factors might betray us but when the whole universe is our companion, we will always have something to enjoy, something to look forward to, something to hold on too.

My Mother

Md Rakib Hasan Rabbi
Student
Department of English

The house is as before
The crimson sparkles of the setting sun touch the western windows everyday
A group of sparrow chirps on the bunches of the old Banyan tree,
In every noon, the flickering ray touches the wide balcony
And southern air swings the hanging roseate shirt.
Someone searches for the rhythm of Rabindra sangeet from old casette
Still, someone dives into Jibananda on a gloomy rainy day,
Tinkles of teacup beats with thunderstorm
And someone hides in the warmth of love on winter night.

The house is as before
So as the people.
They rise with morning birds and roam all day long
And comes back to nest with evening dew.
They smile, they cry
They chirp every day.
All are there, everything is there
Without my innocent loving mother,
She is in a deep sleep in a little soil house
Surrounded with dark and dust
All alone, all day
In the deep darkness.
The house is as before
But not the little Krishnochura
Without the care of that woman
It is dying a little death every day.
The alone Nightingale still sings
The little cat still waits
And the hungry dog stares at the door

For the love of the woman
Who is now not in among.

The yellow house is like before
Only the woman is missing
Who used to dry her hair on the roof
Made pickles of olive.
That woman always smiled a hidden smile
Like the sun of a cloudy day,
She never desired anything
That woman was as silent as morning breeze
Only her eyes tremored in pleasure and pain.

Days gone; night gone
And gone the memories of my mother
My mother made dua for other
And got nothing in return.

The old wall gets the touch of color
But nobody cleans the dust of my mother's grave
They talk about many things
But not about my mother.
Their hands still seek kindness of God
But not dua for my mother,
Nobody loved my mother ever
Except the alone evening crow.

A new person is in my mother's room
A new person touches the iron reeling
Everything changed, everyone changed
Only the photo in the corner of the wall
On what nobody touched
On which nobody noticed
Maybe intentionally, maybe not
There, my sixteenth aged mother is smiling
With sorrowful eyes.

Does Foreign Remittance Work as a Socio-Economic Growth Engine?

Dr. Jannatul Ferdaous
Associate Professor & Chairman
Department of Business Administration in Finance and Banking

Remittance is a payment of money transferred to a different party, usually one in another country. The sender is normally a foreign employee and the receiver a family member back home. People in low- and developing-income nations rely on remittances as being one of their major sources of revenue, frequently surpassing direct investment, and foreign development aid. Bangladesh is now the eighth-largest recipient of remittances and the sixth-largest sender of migrants in the world, according to the World Migration Report 2022. Saudi Arabia, on the other hand, has historically provided Bangladesh with the most remittance inflows. Remittances have been a significant development driver for many developing nations in the modern age, opening job opportunities for home workers abroad. It helps a nation increase its gross domestic product and reduce poverty.

Remittances have recently become one of the most significant economic factors in Bangladesh. It affects economic development, benefits the balance of trade, boosts national savings, raises foreign currency reserves, and speeds up the flow of money. Remittances have generated around 35% of export revenues during the past 20 years. Additionally, it exceeds international aid. Remittances are the second-largest source of foreign currency earnings in Bangladesh after the textile industry, and as a result, they assist in reducing reliance on international aid. When the expense of foreign goods is subtracted from the garment industry's foreign exchange profits, it emerges as the sector with the highest foreign exchange earnings. Due to the growing proportion of unskilled or semi-skilled workers compared to professionals in foreign migration, remittance income is growing daily but more slowly than the pace of emigration from Bangladesh. Remittances' percentage of GNI (Gross National Income) is rising daily. Nearly all of a country's macroeconomic metrics are positively impacted by remittances. Remittances include both positive and bad aspects, such as the brain drain, but generally they have a highly positive impact on Bangladesh's economy.

It doesn't need to be emphasized how important international remittances are to Bangladesh's economy. Remittances have been named as one of the three main reasons that, along with the readymade garment (RMG) industry and non-farm activities in the agriculture sector, are responsible for lowering the prevalence of poverty in Bangladesh and preserving a favorable balance of trade. Bangladesh contributed to the 10 billion USD in remittances received during the 2010 fiscal year.

Remittance inflow's contribution to the balance of payments' surplus balance and increased remittance inflow to GDP help to lessen the deficit. Bangladesh's export earnings and import remittances account for 49.22 percent and 29.36 percent, respectively, of the country's foreign remittances in the trade balance, which rises with economic growth. Following the export of ready-made clothing, remittances are Bangladesh's second-largest source of foreign currency revenues. Bangladesh was rated eighth in the world by the World Bank for remittance inflows in 2015. Consider investing the earnings of expatriates in a profitable industry. If so, they can contribute to output, development, and job prospects, among other things, and remittances can help support the expansion of the current accounts' surpluses A recent World Bank research found that remittances had contributed to a 1.5% decline in poverty in Bangladesh. However, compared to the fiscal year of 2016, when it was 14931.16 million USD, the overall remittance dropped by 14.5 percent to USD 12769.5 million. In the fiscal year 2017 [Bangladesh Bank 2017], the remittance lost 5.17 percent of GDP, 49.2 percent of all export revenues, and 29.4 percent of import payments. As a result, we should investigate the issue and come up with the best remedy. Household remittances, communal remittances, remittances from migrant workers, and social remittances are the four categories into which the remittance can be divided.

The International Day of Family Remittances (IDFR) was established by the United Nations General Assembly on June 16. According to the IDFR, there are more than 0.2 billion migrant workers, including men and women, who support more than 0.8 billion family members back home. This day also highlights the tremendous fortitude of migrant workers in the midst of a global pandemic, natural disasters, and economic hardship. The Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration's (Objective 20) push for lower remittance costs and more financial inclusion through remittances, and the IDFR has received attention on a global scale.

The recent depreciation of the Taka against the US dollar brought on by the crisis between Russia and Ukraine put considerable strain on Bangladesh's economy. There are now about 100 BDT in a dollar. As is well known, remittances were a major factor in Bangladesh's foreign exchange rate. Remittances to Bangladesh increased from 1.49447 USD Billion in February to 1.85997 USD Billion in March 2022. However, due to a lack of actual experience, Bangladeshi laborers and workers lag significantly behind those in other countries like India, Pakistan, and Malaysia. Many people are working in this sector, yet they are unskilled. Our people will do better than others if the government assists in this field with technological advancement, vocational education, and training. That's why, despite having so many individuals, we are unable to make more money from this sector. If we focus on the skills development of these people and maximize our potential, total remittances will expand faster than we expect.

The global conflict may adversely impact the global economy, and our export and remittance may slow down. The rate of foreign currency goes up, resulting in increased import costs and pressure on foreign currency reserves. Whatever the war has made pressure on our remittance reserve as Ukraine is suffering from many reasons due to the war. We can't deny that remittances are assisting developing countries in improving their economies.

Motherly

Nuri Shahrin Suba
Student
Department of Public Administration

She was like a sinking boat
since she was born,
An Angel kept pulling her
with all strength on and on...

The angel was so beautiful
and kind as well.
She was very sure that
she will never the world as hell.
But the angel left keeping
behind all the memories,
growing up she realised,
with angel she was living in dreams!

Now she finds the world
as a nasty battlefield!
She feels tired and
looking for an angel
who would feel like motherly.

Being a BUPian

Faria Fatima Roza
Student
Department of Business Administration in Management Studies

Being one of the finest universities in Bangladesh, BUP has achieved so much within a few years of its establishment. I believe as a university, the success of it depends not only on the way the teachers teach or the curriculum of it but the way a university treats its students, who are the lifeline of it. And BUP as a university is like a family as I've seen, where the faculty members and other officials are the guardians and students are like their children.

First of all, when I joined as a first year student, the whole world was stricken with the worst pandemic of the millennium and within few months of the physical classes when students couldn't finish saying, 'Hi!.....Hello!', whole country was closed due to lockdown. But the varsity administration with their strong management kept grab on the students by launching online classes and psychological supports during those worst days. This was the most futuristic decision taken by any varsity in our country considering the situation. When the whole education system was struggling to find a way, BUPians were busy with their assignment, term papers and term exams, keeping their minds away from the horror of the pandemic. Obviously, the virtual system can't fulfil the normal way of education, but BUP provided more than the best available alternative possible during that time.

With time, when the pandemic was gasping, BUP started to turn lively again with all its faculty members and students swerving all around the campus. That's the time when I got introduced properly with the 'Seniors'. Whereas 'Seniors' are like an alien in any other Higher educational institutes because of so many unfair incidents of ragging, that meaning became the symbol of strong moral and mental support due to the stronghold of the management at every corner of the campus including strict monitoring even at virtual world. BUP has showed the whole education system in our country, how 'Senior' students can support the newbies to uplift their moral strength to be part of the greater workforce. But this strictness doesn't mean that 'Joy in varsity life' is banished but has outclassed for BUPians through different platforms like clubs which shows that 'Sky is the Limit'. These clubs are a fun way of enjoying as well as diverting the students to teach professionalism with different events and competitions.

I've spending sleepless nights completing assignments and term papers but still felt lively at the end

of the day because of meeting those great sacrificing souls at the varsity who gave tremendous support at any time.

BUP made a clear barrier in my life, letting me focus on my future goal as well as enjoying my life at the same time. What more a young fellow like me wants in life!
The best thing ever happened to my life is adapting myself to be a BUPian

Moments of the Sea

Tahsina Khan
Deputy Director (Research)
Centre for Higher Studies and Research

Looking at the horizon
Where the sky meets the sea,
Walking on the shoreline
Just you and me.

Let the winds blow away the worry,
Let the waves take away the pain,
Let the clouds come down,
And for us, let it rain.

See the sun slowly sets
Stars dazzle upon the sky,
Raindrops and wind come along
and our dreams fly high.

I will sing to you
Looking at your eyes,
Saying all the words in my heart
Till the light comes with the sunrise.

The silence in the mountains
And the whispering breeze
Do you know, what they say
Talk to me, please.

The dreams we share,
The wishes and belief.
All those moments, we cherish
In all those moments we live.

Bangladesh from 'Unskilled Age to Access to Information (a2i)' Programme

Md. Ashiqur Rahman
Student
Department of Sociology

The day was not so far when we used to rush to the gates of schools and colleges just to have a look on the mark sheets of public exam results. We had to wait three or more days to receive a message via letter from family or workplaces. People wouldn't think of cellular phones and smart phones. But those days are long gone. Internet and digitalisation of everyday life changed the world, including Bangladesh. In this era of digitalisation and instant wireless communication, the handful use of internet is considered a very necessary and important skill, both in personal and professional life.

Bangladesh is a country with more than 16 crore people. Now the question is whether this population is a blessing or curse. The answer is very simple. Proper utilisation of population by creating a skillful generation can be a blessing. Also, by providing skill development training we can ensure job opportunities for our people in foreign countries which can lead us to be a hub of foreign currencies in South Asian region. As we are talking about digitalization of Bangladesh, creating skilled population, reducing the problem of unemployment, regarding this there is a dream project called "Access to Information (a2i)."

Access to Information (a2i) is a flagship programme of Bangladesh government which is run by ICT Division and supported by Cabinet Division and UNDP. This programme leads its approach to Digital Bangladesh -2021 by aiming to achieve SDGS. This programme is headed to ensure quality health for all, sustainable agriculture, digital financial services, disability innovation lab, empathy journey, innovation culture in civil service, service innovation fund, SDG tracker, one-stop service centre and many more goals.

This a2i program is an interactive programme with mass people. We can submit our ideas and plans about development and digitalization of different sectors. It also provides innovation fund to make the ideas possible in real world. Till March 2021 total proposed plans were 10,230 and 1,530 plans were in progress. Also, 17 plans were successfully completed.

Having a huge population can be a major obstacle if the actions we take aren't properly planned. Access to in Information (a2i) programme plays a vital role here to create a skilled workforce. It has ongoing skill development program through stipend and apprenticeship. More than 43,000 successful

apprentices have been possible through this programme.

Finally, we can say that Access to Information (a2i) programme is a dream project for Bangladesh to diminish the unemployment, the accountability of governance and become digital in all prospects of society. Government is doing their part to create a skilled nation, but we also have to work properly to make this programme successful.

References:

1. All the statistical numbers and information have retrieved from the official site of http://a2i.gov.bd

When Suicide Comes in Clusters: Depression or Copycat Effect?

Maliha Tabassum
Lecturer
Department of Mass Communication and Journalism

Suicide has become a 'Worrying Trend' in Bangladesh now-a-days. According to a recent report, at least 101 students committed suicide in the year of 2021 which shows a growing number of suicidal tendencies among the students of Bangladesh (The Financial Express, 2022). The University of Dhaka has the largest number of suicide cases, with male students having a higher rate than female. Suicide rates have risen worldwide especially as a result of the pandemic. In Bangladesh, at least 151 students committed suicide within 450 days of lockdown, according to a study published online on April 15, 2020 titled 'Multidisciplinary Research Priorities for the COVID-19 Pandemic: A Call to Action for Mental Health Science'. One/two suicides can readily be ignored by classifying as mood disorders, panic attacks, or just a clinical depression case. But now-a-days, waves of suicide are hitting the country very frequently, in clusters. What exactly is wrong?

According to the World Health Organization, about 800,000 people die by suicide each year, or one every 40 seconds. Suicide is the second highest cause of death among people aged 15 to 29 in the world. According to studies, young adults are the most vulnerable age group worldwide. Youths have been shown to cope with a variety of social risks. Conflict in personal relationships, depression, poverty, and unemployment are indeed some of the prominent risk factors (Bilsen, 2018). However, in a third-world country like ours, all of these issues are already present. So, when we see similar incidents happening back-to-back, one after another, like clusters, 'Factor' seems a light word from vocabulary.

Ecological studies (Swanson & Colman, 2013) strongly suggest that suicide can be "contagious" (i.e., high exposure to suicide may affect the risk of suicide and related outcomes). Suicide stories and their depictions in the media can influence youths alarmingly. The evidence for the influence of reports in the news media is stronger than any fictional formats (Gould, Jamieson & Romer, 2003). In 2020, the suicides of a popular Indian movie star received the most media attention in Bangladesh. Even the suicide of an international renowned artist, or, more recently, two West Bengal television actresses, have received widespread media coverage in our country. Alongside mass media, social media also works as a catalyst in shaping opinions on victims. The recent increase in highly publicized cases of suicide that involve social media has created much debate.

A copycat effecr, according to Psychology Today, is a replication of another suicide that the person committing suicide is aware of either through local knowledge or media depictions.

This is no secret that being exposed to suicide, whether directly or through the media, makes people more inclined to engage in suicidal conduct. Suicide contagion is a medical term for the phenomena. Direct exposure to suicidal incidents, peer group reactions following a suicide, and a victim's situation that is somehow justified can all influence a person with suicidal tendencies.

Last year, I lost one of my classmates from Dhaka University. He committed suicide due to job-related stress. Many of my peers were saddened by his death and shared memories of him. I saw long Status updates loaded with anguish, beginning with something like, "I can't believe you are gone/no more." Many attempted to glorify his death by describing how disgustingly pathetic he felt about himself, societal norms, or sometimes political systems. As if he has taken a justified step. Five DU students are said to have committed suicide since his death. Who knows if this is a result of the copycat effect or not. Following the publicized suicide of someone in a similar situation to them, some people may conclude that the same action may be suitable for them as well. Back-to-back suicides in Dhaka University, may have caused a copycat effect from media coverage or social media endorsement.

Many of us may recall Aritri, the Viqarunnisa schoolgirl. In Aritri's case, students took up a position near the institution's main door, demanding that mental and physical torture on students be prohibited, that threats of expulsion be stopped, and that the school authorities should publicly apologize to Aritry's parents for "humiliating" them. I am not opposed to the protest but to their banners. My attention was pulled to a banner that read, "Before they killed her soul, she killed herself". A small child is holding a placard that eloquently defends suicide.

In all of these suicide instances, we somehow fail to notice that suicide has been subtly transformed into a "heroic" deed. Provocative words and banners should never be displayed or supported by the media. We, as users of social media, should also write, post, and share appropriate content. 'We can't rationalize suicide no matter what,' is a lesson that should be remembered.

Suicide might well be viewed as a glamorous ending, with the victim receiving attention, sympathy, and worry that he/she did not receive in life. However, we must be more sensitive to such Issus. In India, the film Padmavat received harsh criticism, particularly for glorifying Padmavati's death. Some individuals objected to Bansali's portrayal of history (despite Director claim that he followed historians' descriptions). We need to take a strong stance against suicide. We need to quit playing the "blame game" and focus with ourselves and our loved ones.

"But in the end, one needs more bravery to live than to kill himself," Alburt Camus famously stated. We, the youth, must exhibit this boldness. Youth is an wonderful gift, it is a crime to waste it.

References:

1. Bilsen, J. (2018). Suicide and youth: risk factors. Frontiers in psychiatry, 540.
2. Express, T. F. (2022). 101 university students committed suicide in 2021, says report. The Financial Express. https://thefinancialexpress.com.bd/national/101-university-students-committed-suicide-in-2021-says-report-1643440541
3. Gould, M., Jamieson, P., & Romer, D. (2003). Media contagion and suicide among the young. American Behavioral Scientist, 46(9), 1269-1284.
4. Swanson, S. A., & Colman, I. (2013). Association between exposure to suicide and suicidality outcomes in youth. CMAJ, 185(10), 870-877.

Perseverance

Mirana Tahsin
Student
Department of Environmental Science (ES)

Is life a phoenix rising from the ashes?
As if it were a horcrux, fabled to have endless chances.
It's a compendium of blinking moments
So why do you get bothered by some insignificant comments?
Despite being aware life is not eternal, you suffer from inferiority complex
Depression, anxiety makes you perplexed.
And thus, you waste your priceless time
With which success does not really rhyme,
You should rhapsodize your spirit
Don't forget you got vivacity beyond limit.
The demons of your repeating activities seek to come out
Shattering the rigid structure screaming out loud,
You should have a manifestation that mesmerize
Which will remove all insecurities that antagonize.
Life is far too brief to be squandered in vain
Be a perseverer for anything to gain.

Managing Human Resource amid the Covid-19 Pandemic: Strategies for a Better Life

Mohammad Ali
Assistant Professor
Department of Business Administration in Management Studies

The World Health Organization (WHO) has declared Covid-19 an international pandemic and the whole world is working to address it. The impact of this Corona virus on socioeconomic life is rapidly evolving and dynamic. Millions of people are being infected with this virus. In the mid of 2021, this virus emerged as a deadly monster in the South Asian region, particularly in India and Bangladesh. Undoubtedly, Covid-19 has shaken the world economy and influenced business activities across the globe. The economic recession due to this pandemic has caused remarkable damage and will become the reason for a similar scenario like the Great Depression in the 1930s. Some common phenomena that are most likely to arise irrespective of the country are food crisis, joblessness, liquidity crisis, transportation problems, remittance shortage, fall in export, shutdown of industries, and so on.

HR executives and professionals may come forward to face the upcoming challenges through adapting and implementing proper strategies to achieve sustainable competitive advantages and to ensure admirable employment relationships. Executives at the apex level of the organization must understand the significance of the strategies that can benefit all the parties. HR department needs to think about rescheduling working time during the period of pandemic. Due to fluctuating market demand, it becomes difficult for organizations to ensure and avail the availability of workers in operations. Hence, ascertain smooth production of goods and services, consensus opinion of employees at different levels is required to facilitate the benefits of stakeholders.

Implementing job rotation technique, flexible working hours, rearrange of schedules and dynamic procedures can create opportunities for the factories operating in Bangladesh to survive in this crisis moment. There is a possibility of massive unemployment due to lay-off of the employees; therefore, a strategy of reducing working hours can accommodate more employees. But implementation of this strategy will be difficult as the lower-level employees' salary is not so high.

Due to restrictions on the transportation and movement of goods and services around the globe, demand for goods and services has been drastically reduced which cause significant financial losses. In Bangladesh, factories and establishments are facing similar problems which are no stranger to them. Hence, cost cutting strategies except lay-off the workers from any organization should be prioritized.

Skilled and semi-skilled workers are the most important human capital and asset, therefore, retaining them can enhance the chance to provide superior goods and services to their customers. In the meantime, the government of Bangladesh has taken the initiative to provide subsidies to assist organizations so that they do not need to lay-off their workforce. But government support will not be continued for a longer period; hence, organizations should plan along with the workers' association to reduce benefits rather than reducing the workforce. Employee benefits structure can be redesigned to reduce the overhead cost and to maintain the competitive edge.

Moreover, the following issues can be addressed as suggested by Prof. Dr. Mohammad Khasro Miah: 1. Considering the living expense of the workers, a compensation policy should be developed. 2. Allow employees to use technologies to facilitate home office at full extent and flexible working schedules. 3. Health and hygiene initiatives should be taken, and infected employees should be supported by the originations. 4. Divert special focus on Covid-19 vulnerable employees and provide necessary equipment for maximum protection. 5. Along with the employees' sickness, the sickness of their family members also matters, particularly, in Covid-19 pandemic. Therefore, sick leave can be modified.

Considering the current situation, revision of Bangladesh Labour Act, 2006 as amended in 2018, is a time demand. Work from home can be incorporated as a new policy along with required provisions and sub-provisions. Such amendments will allow the transition of neo- normal working platforms and diversified workstations. The law should cover the policies regarding use of technology and scope to work from home. Moreover, to ensure a better industrial working environment, the job security of employees can be incorporated considering such pandemic. Sound relations depend on mutual faith, cooperation, and sympathy which are crucially required to face upcoming challenges and industrial turmoil due to this deadly virus Covid-19. We are passing wartime now. Aftermath effect of coronavirus may be deadlier than the current situation. So, sound relations between employees and employers and wholehearted support can save both the parties in this catastrophic situation.

Business owners, professionals and government need to be vicarious and sympathetic towards employees during and upcoming economic collapse due to Covid-19. They need to be structured and well prepared to ensure employee safety, enhance engagement and commitment, improve productivity, design compensation, and develop win-win strategies for both employees and employers. Development of time-based HR practices like, technology-based HR practices, high-performance HRM, high-commitment HRM, talent management, responsible leadership, remote leadership, etc., are highly required to acquire sustainable employee performance to align with organizational performance.

Reference:

1. Miah, M., K. (2020) OP-ED: Human resource management during a pandemic. Available at: https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2020/06/04/human-resource-management during-a-pandemic (Accessed: 26 December 2021).
2. Miah, M., K. (2020) A critical discussion on industrial management and Covid-19. Available at: https://thefinancialexpress.com.bd/views/a-critical-discussion-on-industrial-management-and -covid-19-1599059806 (Accessed: 27 December 2021).

Hunting Peace

Md Shariful Hasan Khan
Assistant Director
Office of the Registrar (Council Section)

Whatever is our name and fame
We are the same in the timeframe.
The earth still spinning without interruption.
The current world order is in great disruption.

Warlords' desires for power, wealth, and dignity,
Civilians are oppressed for the sake of security.
We keep searching for beauty and peace,
Not a lot of people accomplish that peace.

Hunting peace of mind should be the intention,
Let's spread eternal love without expectation,
Considering feats of life come with an expiration.

Let's have a visit to a hospital and then to graveyards.
How mighty politicians and generals are stowed!
How superstars with mega-stardom are signified!
Nothing but love, and good deeds will last,
Say goodbye to malice and welcome first love.

পৃথিবীর সবচেয়ে তেজস্ক্রিয় স্থান কোনটি?

সামিরা তাসনিম অপরাজিতা
শিক্ষার্থী
পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ
ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স

'তেজস্ক্রিয়তা' শব্দটির সাথে এখন আমরা কেউই আর অপরিচিত নই। বিশেষ করে, পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র (nuclear power plant) আর পারমাণবিক বোমার সূত্রে আমাদের এ বিষয়ে হাতেখড়ি হয়ে গেছে। সহজে ব্যাখ্যা করতে চাইলে আগে তেজস্ক্রিয় মৌলের কথায় আসতে হয়। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে এ পর্যন্ত মোট ১১৮টি মৌল আবিষ্কার করেছেন। ('periodic table' google করে পাওয়া যাবে) রুল অফ থাম্ব হিসেবে, মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটোনের সংখ্যা ৮০ ছাড়িয়ে গেলেই সেটা তেজস্ক্রিয় ধর্ম দেখাতে শুরু করে। যেমন: ইউরেনিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় মৌল, যা পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র ও বোমাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তেজস্ক্রিয় মৌলের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি (আলফা, বিটা, গামা ইত্যাদি) বিকিরণ করে থাকে। তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো দৃশ্যমান আলোর মতোই একেকটি তরঙ্গ, তবে এদের কম্পাঙ্ক ও শক্তি দৃশ্যমান আলোর তুলনায় অনেক বেশি। এর ফলে, তেজস্ক্রিয়/ionizing রশ্মিগুলো আমাদের শরীর ভেদ করে গেলে শরীরের বিভিন্ন ক্ষতি সাধন হতে পারে।

এর একটি সুপরিচিত উদাহরণ বিজ্ঞানমহলে আছেন। তিনি হলেন রেডিয়াম মৌলের আবিষ্কারক, দুইবার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, বিজ্ঞানী ম্যারি কুরি। তিনি এবং পিয়েরে কুরি মিলেই প্রথম 'radioactivity' শব্দটির প্রচলন করেন। দীর্ঘদিন ধরে তেজস্ক্রিয় মৌল নিয়ে কাজ করার ফলে তার দেহে তেজস্ক্রিয়তার বিরূপ প্রভাব দেখা দেয়; মেরুরজ্জের রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তেজস্ক্রিয়তার এ প্রভাব দু'ভাবে আমাদের দেহে পড়তে পারে: দীর্ঘমেয়াদী (chronic) প্রভাব ও স্বল্পমেয়াদী (acute) প্রভাব। ম্যারি কুরি দীর্ঘমেয়াদী তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবের শিকার হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে (বছরের পর বছর) অল্প পরিমাণে তেজস্ক্রিয় রশ্মির সম্মুখীন হয়েছিলেন। আবার, স্বল্পমেয়াদী প্রভাব তখন পড়ে যখন কেউ খুব অল্প সময় ধরে (মিনিট-ঘণ্টা) খুব বেশি পরিমাণে তেজস্ক্রিয় রশ্মির সম্মুখীন হয়। জাপানের হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা হামলায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা বা রাশিয়ার চেরনোবিলের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের দুর্ঘটনায় উপস্থিত কর্মীরা এধরনের প্রভাবের শিকার হয়েছিলেন।

তবে এমন ভাববার কারণ নেই যে তেজস্ক্রিয় মৌল শুধু বোমা বা পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রেই উপস্থিত। বরং, পৃথিবীর সবখানে, এমনকি মহাবিশ্বেও বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে আছে; যারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করছে। আমরা তাই প্রতিদিনই বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সম্মুখীন হচ্ছি। তারপরও আমাদের সবার শরীরে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব দেখি না কারণ এর পরিমাণ (dose)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, খাওয়ার লবণ আমাদের নিত্যব্যবহার্য একটি দ্রব্য। প্রতিদিন আমরা যে পরিমাণে লবণ খাই, আমাদের শরীর তা বিভিন্ন বিপাকীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে সাম্যাবস্থা বজায় রাখে। কিন্তু কেউ যদি একবারে এক কেজি লবণ খেয়ে ফেলে তবে তার শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। আমরা প্রতিদিন খুব সামান্য পরিমাণে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের শিকার হই। প্রকৃতপক্ষে, প্রাণঘাতী হতে হলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিমাণ কমপক্ষে ঘণ্টায় ২ সিভার্ট হতে হবে (sievert হলো বিকিরণ dose এর পরিমাপ একক)।

কলাতে পটাশিয়াম থাকে, যা মাঝেমধ্যে তেজস্ক্রিয় হতে পারে। সেক্ষেত্রে, কলা থেকে ঘণ্টায় ০.১ মাইক্রো সিভার্টের (১ মাইক্রো সিভার্ট = ১০-৬ সিভার্ট) মতো বিকিরণ হতে পারে। অন্যদিকে, পৃথিবীর ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন প্রায় ০.১-০.২ মাইক্রো সিভার্ট।

দেখা যাচ্ছে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা মারাত্মক মাত্রায় বিকিরণের শিকার হই না। তাহলে কারা এমন বিকিরণের সম্মুখীন হতে পারে?

যেসব স্থানে আগে কখনো পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছে; সেসব স্থানে তো বিপজ্জনক মাত্রায় বিকিরণ হওয়ার কথা। অথচ সরেজমিনে গাইগার কাউন্টার (ionizing বিকিরণ পরিমাপের যন্ত্র) দিয়ে মাপলে দেখা যায়, হিরোশিমায় বিকিরণের পরিমান প্রতি ঘণ্টায় ০.৩ মাইক্রো সিভার্টের কাছাকাছি। আবার, চেরনোবিলের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের দুর্ঘটনাস্থলে এর পরিমাণ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৫ মাইক্রো সিভার্ট। মাটির উপরে না খুঁজে চাইলে আমরা ভূগর্ভস্থেও যেতে পারি। চেক রিপাবলিকের ইয়াকিমভ শহরে অবস্থিত একটি পুরনো ইউরেনিয়াম খনিতে বিকিরণের পরিমাণ প্রতি ঘণ্টায় ১.৭ মাইক্রো সিভার্ট পর্যন্ত হতে পারে। তাহলে তো পৃথিবীর কোনো স্থানেই বিপজ্জনক পরিমাণে ionizing বিকিরণ পাওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে পৃথিবীর বাইরে গেলে কি এমন বিপজ্জনক স্থান খুঁজে পাওয়া যাবে?

বিমানে ভ্রমণকালীন ৩০ হাজার ফিট উচ্চতায় উঠলে আমাদের শরীর ঘণ্টায় ২ মাইক্রো সিভার্ট বিকিরণের শিকার হয়। আরও উচ্চতায় উঠতে থাকলে বিকিরণের পরিমাণও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এমন হলে নিশ্চিতভাবেই মহাকাশচারীদের সবচেয়ে বেশি বিকিরণের শিকার হওয়া উচিত। দেখা যায়, মহাকাশ স্টেশনে কাজ করা একজন মহাকাশচারী ঘণ্টায় ১৮.৫ মাইক্রো সিভার্ট বিকিরণের সম্মুখীন হন। তাঁরা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে ক্ষতিকারক বিকিরণের সম্মুখীন হলেও সবচেয়ে বেশি বিকিরণের শিকার হওয়া মানুষ নন। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিকিরণের শিকার হওয়া মানুষদের আমরা সবাই চিনি। প্রতিদিনই আমাদের আশেপাশে তাদের দেখি। তারা হলো ধূমপায়ী। আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, একজন ধূমপায়ীর ফুসফুস। প্রতিদিন একজন ধূমপায়ীর ফুসফুস প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৮.৩ মাইক্রো সিভার্ট পরিমাণ বিকিরণের শিকার হয়। এই বিকিরণ হয় সিগারেটে থাকা তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়াম ও সীসার কারণে।

প্রশ্ন আসতে পারে, মহাকাশচারীরা তো ধূমপায়ীদের থেকে বেশি বিকিরণের শিকার হন, তবে ধূমপায়ীর ফুসফুস কেন সবচেয়ে বেশি তেজস্ক্রিয়? এর উত্তর হলো, মহাকাশচারীরা বিকিরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য বিভিন্ন প্রতিরক্ষামূলক পোশাক (যেমন, স্পেস স্যুট) ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়াও, মহাকাশযান তাদের কিছুটা সুরক্ষা দিয়ে থাকে। কিন্তু একজন ধূমপায়ী সেচ্ছায় প্রতিদিন নিজেকে সরাসরি উচ্চমাত্রার ক্ষতিকারক বিকিরণের শিকার করে। সুতরাং, পৃথিবীর সবচেয়ে তেজস্ক্রিয় স্থান হলো একজন ধূমপায়ীর ফুসফুস।

সূত্রঃ

1. Derek, M. [Veritasium]. (2014, December 17). The Most Radioactive Places on Earth [Video]. YouTube. https://youtu.be/TRL7o2kPqw0
2. Marie Curie. (2022, April 6). In Wikipedia. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie

একটা রাজধানী "মানুষ"

তানভীর আহমেদ
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং

রাজধানী বড় ছিল,
ছিলো রন্ধ্রে রন্ধ্রে আঁকাবাঁকা মোড়,
চলতো দৌড়ে, উড়ে বেড়ানো কণিকারা,
হাত বদলে চলতো সময়, না জানা সব ঘোর!

কেমন যেন এক কম্পনে থাকতো,
থাকতো বেঁচে থাকা এক সুর,
সেই সুরে ছেঁদ হলে নুয়ে পড়তো,
জীবন চালিকাপুর।

ছিল একটি ঘর, দু-প্রকোষ্ঠে ভাগ,
হাজারো কর্মযজ্ঞে ঘরটিতে পড়েছিল হাজারও ভাঁজ!
কত বিমিশ্রিত স্মৃতি, অতিরঞ্জিত ছোঁয়া,
ভাঁজ গুলোতে মিলিয়ে যায়, সুরে বেড়িয়ে যায় ধোঁয়া।

রাজধানীতে রাত্রি নামতো,
আকাশ ছিল না রাজধানীর!
ফুল ফুটতনা নগরীতে, পরজীবীরা নাগরিক।

ফুল জন্মাতো ভালোবাসায়,
কখনো অবহেলায় ফেলনা হয়ে!
পরম স্নেহের ফুলে হাত রাখতোনা অনেকেই ভুলে!
ফুলেরা পরম স্নেহের,
যখন ফুল কোনো অভিজাত নগরীর।

রাজধানী অনেক বড়,
রাজধানীতে আজ মেঘ!
বৃষ্টিরাও আসেনা,
উষ্ণতা নিয়ে গেছে বৃষ্টিদের।

রাজধানী অনেক মলিন,
কখনো রুক্ষ, কখনো নিরুপায়।
মসৃণ তল রাজধানী খুঁজে,
ডুবে যাচ্ছে ক্রমে অতলে!

'ফিকা': সুখী সুইডেনের সরল মন্ত্র

সঞ্জয় বসাক পার্থ
প্রভাষক
ডিপার্টমেন্ট অব মাসকমিউনিকেশন
অ্যান্ড জার্নালিজম

প্রতি বছর ২০ মার্চ পালিত হয় International Day of Happiness বা আন্তর্জাতিক সুখ দিবস। দিবসটিকে সামনে রেখে দশ বছর ধরে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের তালিকা বা World Happiness Report প্রকাশ করে আসছে জাতিসংঘ। চলতি বছর বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের তালিকায় সপ্তম নামটি সুইডেন। ০ থেকে ১০ এই মাপকাঠিতে দেশটির এবারের স্কোর ৭.৩৮।

তালিকায় প্রতি বছরই প্রথম দশটি দেশের মধ্যে নাম থাকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ সুইডেনের। কিন্তু সুইডেনবাসীর এই সুখে থাকার রহস্য কি? উত্তর খুব সরল। 'ফিকা'!

প্রত্যেক সুইডিশ কর্মজীবী ব্যক্তির কাছে ফিকা শব্দটি অতি পরিচিত। বলা ভালো, শব্দটি তাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অফিসে ফাইল নাড়াচাড়া করা কিংবা ক্লায়েন্টকে দরকারি মেইল পাঠানোর চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এই ফিকা। কিন্তু এই ফিকা আসলে কী?

সহজ বাংলায় বলতে গেলে, অফিসের কাজের ফাঁকে কোনো এক সময়ে সহকর্মীদের সঙ্গে একসাথে বসে এক পেয়ালা কফি, মুখরোচক কেক কিংবা সামান্য একটু মিষ্টিমুখ করা- পুরো এই বিষয়টিকেই সুইডিশরা বলে ফিকা। নানা রকম সুস্বাদু কেক, পেস্ট্রি বানানোয় সুইডিশদের জুড়ি মেলা ভার। আর কফি খাওয়ার দিক থেকে সুইডিশরা অন্য যেকোনো জাতির থেকে এগিয়ে। ফিকা'র মেন্যুতে কফি ও কেকের উপস্থিতি তাই অনেকটা অবশ্যম্ভাবীই বলা চলে।

কোনো কোনো সংস্কৃতিতে অফিসে কাজ ফেলে একসাথে সময় কাটানোকে 'সময় নষ্ট' হিসেবে দেখা হলেও এ বিষয়ে সুইডিশদের দৃষ্টিভঙ্গি একদমই বিপরীত। তারা বিশ্বাস করে, ছোট ছোট এই কর্মবিরতি, সহকর্মীদের সাথে কফি পান-এগুলো তাদের কর্মস্পৃহা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। কিছু সুইডিশ অফিসে কর্মীদের প্রতিদিন বাধ্যতামূলকভাবে ফিকাতে অংশগ্রহণ করতে হয়, এবং অফিসের পক্ষ থেকে তাদের জন্য বিনামূল্যে উন্নত মানের কফিও সরবরাহ করা হয়।

সুইডিশদের বিশ্বাস, ফিকা মানে শুধু একসাথে কিছুটা সময় কাটানোই নয়, বরং এখান থেকে সৃষ্টিশীল সিদ্ধান্ত ও উদ্ভাবনী ধারণাও জন্ম নেয়। শুধু কথায় নয়, কাজের ক্ষেত্রেও এটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে তারা। দেশটির অন্যতম বড় মেগা ব্র্যান্ড 'ইকিয়া' তাদের বাণিজ্যিক ওয়েবসাইটের একটি অংশে ফিকা সম্পর্কে লিখেছে- 'ফিকা নিছক একটি কফি-বিরতির চেয়েও অনেক বেশি কিছু। ফিকা মানে সহকর্মীদের সাথে নির্ভার সময় কাটানো, তাদের সাথে ব্যক্তিগত অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া, আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করা। এমনকি কোম্পানির সেরা অনেক সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় ফিকা'র সময়'।

সুইডেনের অফিসগুলোতে ম্যানেজমেন্ট স্টাইল একমুখী (কর্তৃপক্ষ থেকে কর্মীদের দিকে একপাক্ষিকভাবে সিদ্ধান্ত আসা) নয়, বরং অনেকটাই 'ফ্ল্যাট'। যে কারণে ফিকায় অফিসের বস এবং অন্য সহকর্মীদের সমান ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকে। সবাই

সেখানে সবার কথা শোনে, কারোর মস্তিষ্কে নতুন কোনো উদ্ভাবনী চিন্তা থাকলে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সেটি সবার সাথে ভাগ করে নেয়। এটি একই সাথে যেমন কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ায়, তেমনি একঘেঁয়ে কাজের ক্লান্তি দূর করে কর্মীদের চাঙ্গা রাখতেও সহায়তা করে।

ফিকা সংক্রান্ত সুইডিশদের এই বিশ্বাস যে মোটেও অমূলক নয়, তার প্রমাণ মেলে বিভিন্ন বৈশ্বিক সূচক থেকে। কর্মীদের উৎপাদনশীলতার সূচকে পুরো বিশ্বে সুইডেনের অবস্থান নবম। সুইডিশরা পারিবারিক জীবনকে উপেক্ষা করে শুধু কাজের পেছনে ছোটায় বিশ্বাসী নয়। কাজ ও পরিবারকে সমান প্রাধান্য দেয় বলে তাদের মানসিক ও শারীরিক চাপ তুলনামূলক কম, যে কারণে সুইডিশদের গড় আয়ু প্রায় ৮৩ বছর।

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) এর ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স সূচকে ১০ এর মধ্যে সুইডেনের স্কোর ৮.১। স্বাস্থ্য সূচকের স্কোর আরও বেশি, ৮.৬। নিজেদের জীবনযাত্রার ধরণ নিয়ে সুইডিশরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট, যে কারণে 'Life Satisfaction' সূচকেও দেশটির স্কোর ৮.১। সুইডেনবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই সবকিছুর পেছনে বড় একটা অবদান রাখে ফিকা।

করোনা পরবর্তী বিশ্বে শারীরিক জটিলতার পাশাপাশি মানুষের মানসিক চাপ বেড়েছে অনেকগুণ। পাশাপাশি কর্মদক্ষতা বাড়ানোর চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই কঠিন সময়ে কর্মীদের একটু নির্ভার রাখতে ও কর্মস্পৃহা বাড়াতে সুখে থাকার এই 'সুইডিশ মডেল' বোধহয় অন্য দেশগুলোরও অনুকরণ করার সময় এসেছে!

তথ্যসূত্রঃ বিবিসি, OECD, Forbes.com

দুরত্ব

আসিব হোসেন
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ইকনোমিক্স

কলিংবেলে চাপ দেওয়ার আগেই দোয়া পরে বুকে ফু দিয়ে দিলো নীল। আজও সাড়ে এগারোটা বাজিয়ে ফেলেছে। বাবা জেগে না থাকলেই হয়। এই মানুষটা কথায় কথায় ঝামেলা করে তার সাথে। নিতু দরজা খুলেই ঠোঁটে আংগুল দিয়ে চুপ থাকার ইশারা করলো। নীল ফিসফিস করে বলল,
--ঘুমায় নি?
নিতু মাথা নাড়লো। পাশের ঘর থেকে নীলের বাবা বলে উঠলো,
--কে রে নিতু? কুলাঙ্গারটা ঘরে ফিরেছে? একদম ঘরে ঢুকতে দিবি না। যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যেতে বল। এরকম বদ ছেলে আমার দরকার নেই।
--হ্যাঁ হ্যাঁ চলে যাবো একদিন ঠিকই। তোমার ঘরে আসবো না। (নীল)
বিড়বিড় করতে করতে নিজের ঘরের দিকে গেলো সে, পিছন থেকে তার বাবার চেচামেচির শব্দ শোনা যাচ্ছে।
নিজের ঘরে গিয়ে কাপড় বদলাতে বদলাতে নিজেই বলছে নীল,
--থাকবোই না শালার এই ঘরে। একটু দেরি করে ঘরে ঢুকলে কি হয়? কই অন্যদের বাসায় তো এমন না। আমার বাসায়ই শুধু এই ঝামেলা। ধুর, ভালাগে না। এই মানুষটা সবসময় এমন করে আমার সাথে।

পরদিন রিমির কলে ঘুম ভাংগে তার।
--হ্যালো, কই তুমি?
--বাসায়, ঘুমাচ্ছি। (নীল)
--ঘুমাচ্ছি মানে? তোমার না আজকে আমার ফ্রেন্ডদের ট্রিট দেওয়ার কথা?
--আজই?
--নীল আমি আর পারছি না তোমাকে নিয়ে। একটা কিছু ঠিকভাবে করো না তুমি। আমরা রেস্টুরেন্টের দিকে যাচ্ছি। তুমি জলদি আসো। বাই।
বলেই কলটা কেটে দিলো রিমি। নীল ঘুম থেকে উঠে কতক্ষণ ভাবলো টাকাটা কোথেকে জোগাড় করবে এখন।
ফ্রেশ হয়ে নাস্তার টেবিলে গেলো সে।
--মা আমার টাকা লাগবে।
--কিসের টাকা?
--একটা নতুন কেমিস্ট্রি টিচারের কাছে ভর্তি হবো। শুনেছি ভালো পড়ায় অনেক।
--তোর না কেমিস্ট্রি টিচার আছে?
--থাকলে কি হয়েছে? লাগবে মা।

--তোদের এইসব বুঝি না আমি। কত লাগবে?
--৩০০০,
--টাকার গাছ লাগিয়েছি আমি? তোর বাবার কাছে গিয়ে বল। রোজ রোজ তোর জন্য কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না। একটু ভালো হয়ে চললেই তো পারিস।

--কার টাকা লাগবে নীলের মা? (বাবা)
--তোমার ছেলের। (মা)
--কিসের জন্য?
--নতুন কেমিস্ট্রি টিচারের ফি বাবা। (নীল)

--পড়ালিখার নাম নাই নতুন নতুন টিচারের কাছে ভর্তি হতেই দেখি শুধু। রিটায়ার্ড বাপের হোটেলে আর কতদিন খাবে? তুমি যে সংসারের বড় ছেলে সেদিকে কোনো হুশ আছে তোমার? একটা দায়িত্ব পালন করো ঠিকমতো? কয়দিন থেকে বলছি আমার চশমাটা ভেংগে গেছে, ঠিক করিয়ে আনো। এনেছো? (বাবা)
নীলের মায়ের দিকে ফিরে বাবা আবার বললো,
--ওকে ৩০০০ টাকা দিয়ে দাও। আর বলে দিও এই মাসে আমি আর একটা টাকাও দিতে পারবো না ওকে।
বাবা চলে গেলেন।
নীলঃ দেখলে মা? কয়টা টাকার জন্য কতগুলো কথা শুনিয়ে দিয়ে গেলো? আচ্ছা উনার আমার সাথে সমস্যাটা কি?
মাঃ তুইও তো সংসারের বড় ছেলে। বাপটা রিটায়ার্ড করে কিভাবে সংসার চালাচ্ছে সেদিকে খেয়াল আছে তোর? একটু বুঝলেও তো পারিস। আমার হয়েছে যত জ্বালা।
নীলঃ হ্যাঁ এখন তুমিও বলো, ধুর থাকবোই না এই বাসায়।

দুপুরে রিমির ফ্রেন্ডদের ট্রিট দিলো নীল। রিমি অনেক খুশি। ওখানে বসেই সবাই মিলে ঠিক করলো এইবার ১৩ তারিখ রাতে তারা কক্সবাজার যাবে। ভ্যালেন্টাইন্সডে টা তারা কক্সবাজারেই পালন করবে। নীল আর রিমির কমন কিছু ফ্রেন্ড মিলে এই প্ল্যান হলো। নীল ভিতরে ভিতরে চিন্তায় পরে গেলো এই টাকাটা সে এখন কোত্থেকে জোগাড় করবে। তার কাছে জমানো কিছু টাকা আছে তবে তা রিমির ভ্যালেন্টাইন্স ডে-এর গিফট কিনতেই খরচ হয়ে যাবে। সবার সামনে কিছু বললো না সে, খুশি খুশি মনে প্ল্যানিং এ অংশ নিলো।

রাতে বাসায় গিয়ে মা কে জানালো বন্ধুরা মিলে ট্যুরে যাচ্ছে। তার টাকা লাগবে। মা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে বাবাকে কিছু বলতে পারবেন না তিনি। খাবার টেবিলে বার বার মা কে চোখ দিয়ে ইশারা করছিল নীল যেনো টাকার কথাটা বলে। এরকম চোখাচোখি তার বাবার চোখ এড়ালো না। বললেন,
--কি হয়েছে?
--কই কিছু না। (মা)
--ভাইয়া ট্যুরে যাবে বন্ধুদের সাথে। তাই চাঁদা লাগবে। (নীতু)
--সারাদিন এই টাকা লাগবে ওই টাকা লাগবে? নীলের মা তোমার এই ছেলে কি টাকা ছাড়া কিছু বুঝে না? কি ছেলে জন্ম দিয়েছো? পড়ালেখার নাম নেই সারাদিন বন্ধু নিয়ে টই টই করে ঘুরছে ফিরছে। আমি এই ছেলেকে আর একটা টাকাও দেবো না।
--কেনো দেবে না? সবার বাবা মা দিচ্ছে না? কই তোমাদের মতো এতো কথা তো শোনায় না কারো বাবা মা। আমার বেলায়ই তোমাদের যত সমস্যা।

--বেয়াদবের মতো কথা বলবে না। এক চড় দিয়ে তোমার দাঁত ফেলে দেবো। আমরা তোমার বন্ধুদের বাবা মায়ের মতো বড়লোক নই। এতো টাকা নেই আমাদের যে তুমি বলবে আর টাকা ঢালবো।
--টাকা নেই তো জন্ম দিয়েছিলে কেন?
ঠাস শব্দে নীল এর গালে একটা চড় বসিয়ে দিলো বাবা। নীল খাবার প্লেট ঠেলে উঠে নিজের রুমে চলে গেলো।

নিতু রুমে পড়ছিলো। বাবা এসে বললেন,
--তোর ভাই কিছু খেয়েছে?
--না বাবা।
--খাবার নিয়ে তোর ভাইয়ের ঘরে যা না একটু মা। তোর মা কে বললাম সে যাবে না।

--আচ্ছা।

নীল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। নিতু এসে ডাকলো,
--ভাইয়া,
--নিতু এখন এখান থেকে যা। একদম বিরক্ত করবি না আমার মুড ভালো নেই।
--বাবা বলেছে খেয়ে নিতে।
--উনার খাবার উনাকে খেতে বল। আমি খাবো না। যা এখান থেকে (ধমকে)
নিতু চলে গেলো। নীল মোবাইলটা হাতে নিয়ে গ্রুপে একটা টেক্সট করলো, "আমি যাচ্ছি না ১৩ তারিখ। তোরা যা।" তার কিছুক্ষণ পর রিমি কল দিলো।
--হ্যালো নীল।
--হ্যাঁ বলো।

--গ্রুপে কি লিখেছো? যাচ্ছি না মানে? আমাদের ফার্স্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে এটা। This needs to be Special. আর তুমি না গেলে আমি গিয়ে কি করবো?
--রিমি আমার কাছে টাকা নেই।
--টাকা নেই তো বাসা থেকে নাও।
--দেবে না।

--আমি কিছু জানি না। এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে আমি কক্সবাজারে কাটাবো ব্যাস্।
--রিমি আমি পারবো না সত্যি।
--পারবে না মানে কি? ম্যানেজ করো।
-- স্যরি রিমি।
--আসলে ভুলটা আমারই। তোমার সাথে রিলেশন করাই আমার উচিত হয় নি। এর চাইতে আমি রায়হানের সাথে রিলেশনে যেতাম ভালো হতো। তুমি আমাকে আর কল দিবে না। যদি ম্যানেজ করতে পারো তবেই কল দেবে।

--আমার কথাটা তো শোনো প্লিজ।

ওপাশ থেকে কলটা কেটে গেলো। নীল কয়েকবার কল করলো বার বার কেটে দিচ্ছে। ম্যাসেঞ্জারে বারবার ম্যাসেজ দেওয়ার পরও রিমি রিপ্লাই দিচ্ছে না। বাবার উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে নীলের।

এরপরের কিছুদিন নীল রুম থেকে বের হতো না ঠিকভাবে। কারো সাথে কথা বলতো না। মাঝখানে রিমি আর যোগাযোগ করেনি নীলের সাথে। রিমির এই রাগ নীলের জানা। ঠিক হয়ে যাবে দুইদিন পরেই। একদিন নীল শুয়ে শুয়ে গান শুনছিলো। দেখলো কে যেন তার দরজার ফাঁক দিয়ে উকি দিচ্ছে। বুঝতে পারলো বাবা। উঠে গিয়ে দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিলো নীল।

১৩ তারিখ রাতে অনেক খারাপ লাগছিলো নীলের। তার বন্ধুরা হয়তো এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে ট্রীপে। রিমি তার সাথে কথা বলে না। সে একলা হয়ে গেছে। মন খারাপ করেই রিমিকে আরেকটা টেক্সট করে ঘুমিয়ে পড়লো নীল। সকালে ঘুম থেকে উঠে রিমির ডে দেখে নীল। একটা ছবি, রায়হানের সাথে। ক্যাপশন দেওয়া "ভ্যালেন্টাইন্স ডে উইথ হিম", লোকেশন কক্সবাজার। রিমি রায়হানের সাথে কক্সবাজার গিয়েছে। এটা দেখে রাগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে। বাবার উপর প্রচন্ড রাগ লাগছে তার। বাবার কারণেই আজ রিমিকে হারালো সে।

সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলো নীল। সিদ্ধান্ত নিলো ওই বাসায় আর ফিরে যাওয়া যাবে না। পকেটে হাত দিয়ে জমানো টাকাগুলো আছে কিনা একবার চেক করে নিলো। আর ফিরবে না সে। ওদিকে তার বাবা মা চিন্তায় অস্থির। ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে গেছে ছেলে।

কোথায় গেছে বলে যায়নি। এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে লাগলো। এখনো ঘরে ফেরেনি। ফোনটাও সুইচ অফ। নীলের বাবা একবার বেরিয়ে এদিক সেদিক খুজে আসলো। পেলো না। বারান্দায় বসে আছেন তিনি, তখনই নীলের মা বারান্দায় আসলো,

--বুঝলে নীলের মা, ছেলেকে এভাবে মারা ঠিক হয় নি। ও ই বা কি করবে বলো, সেভাবে তো ছেলের কোনো আবদার রাখতে পারিনি কোনো দিন। নিজের ব্যর্থতার ঝালটা ছেলের উপর ঝাড়লাম শুধু শুধু।
নীলের মা কিছু বললো না, মুখে আচল চাপা দিয়ে বাইরের দিকে তাঁকিয়ে রইলো শুধু।

বিকেলের দিকে খুব ক্ষিধে পেলো নীলের। একটা পার্কে বসে আছে সে। রাগে অনেকখানি হেঁটে ফেলেছে। কিছু খাওয়া দরকার। পার্কের পাশের দোকান থেকে একটা বনরুটি আর কলা কিনলো। বেঞ্চে বসে বনরুটি টা মুখে দিয়েই বিরক্ত হয়ে গেলো নীল। এই অখাদ্য খাবার কিভাবে খায় কেউ? তার বাবাও খায় এই খাবার। সে প্রায় দেখেছে পাড়ার টং এ বাবা বসে থাকে। মাঝে মধ্যে চা, বনরুটি খায়। ক্ষিধে মেটানোর সবচাইতে কমদামি ব্যবস্থা, তাই বোধহয়। আচ্ছা বাবাকে কখনো বলতে শুনেছে আজ পিজ্জা খেতে ইচ্ছে করছে বা বার্গার খাবো? না বোধহয়। মাংস রাধলেও যেই লোক বড় পিসটা রেখে ছোট পিসটা নেয় তার পিজ্জা বার্গারের প্রতি শখ থাকার কথা না। বাবার আসলে টেস্টবাডে সমস্যা আছে, কোন্‌টা খেতে বেশি মজা বুঝতে পারে না বোধ হয়। হঠাৎ বাবার জন্য কেমন যেনো কষ্ট লাগলো নীলের। গলার কাছে বনরুটি আটকে আসছে বারবার। এভাবে মনে হয় বাবার সাথে রাগ করা ঠিক হয় নি তার।

একটা পাগল ধরনের লোক এগিয়ে আসছে তার দিকে। দূরে একটা বাচ্চা মেয়ে একটানা কেঁদেই যাচ্ছে মাটিতে বসে। পাগলটা তার কাছাকাছি এসে গেছে।
--ভাইজান দুইটা টাকা দেন, ভাইজান।
--২ টাকা দিয়ে কি করবে?
--খাওন কিনুম।
--সত্যি?

--জ্বি, ভাইজান। আপনের কসম।
নীল টংওয়ালাকে পাগলটাকে একটা বনরুটি আর কলা দিতে বললো। দাম মিটিয়ে আগের যায়গায় গিয়ে বসলো নীল। বাচ্চা মেয়েটা এখন আর কাঁদছে না। খুব মনযোগ দিয়ে বনরুটি আর কলা খাচ্ছে। পাগল লোকটা একটু একটু করে কলা ছিলে মেয়েটাকে খাওয়াচ্ছে। একটু পর পর কি বুকে দুজনই খিলখিল করে হাসছে।

রাত ৮ টা বাজে, নীল ঘরে ফিরেছে। কলিংবেলের শব্দে নীতু দৌড়ে এসে দরজা খুললো।
--ভাইয়া কই ছিলি তুই?
--বাবা কই রে?
হাত থেকে বিরিয়ানির প্যাকেট গুলা টেবিলে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলো নীল।
--আছে তো।
--জলদি খাবার লাগা টেবিলে। বাবার পছন্দের তেহেরি এনেছি। খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

নীলের মা তখন এসে নীলকে জড়িয়ে ধরলো। বাবা পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। নীল বাবাকে কললো,
--খেতে আসো বাবা। তোমার পছন্দের তেহেরি এনেছি।
বাবা আমতা আমতা করে বললো,
--এসবের কি দরকার ছিলো। এতোগুলা টাকা খরচ করলি। কই পেলি?
নীল গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললো,
--জমানো টাকা বাবা।

রাতে নীলের বাবা রুমে ঢুকলো। বেডসাইড টেবিলের উপর চোখ পড়তেই একটা প্যাকেট দেখতে পেলেন। প্যাকেটটা খুলতেই

ভেতর থেকে একটা চিরকুট বেরিয়ে এলো, লেখা "স্যরি বাবা, ভালোবাসি" আর সাথে একটা চশমা। নতুন চশমা। তিনি আনন্দে কয়েকবার চোখের পানি মুছলেন। নীল পর্দার আড়াল থেকে দেখে অবাক হলো, তার বাবাও কাঁদতে পারে! চশমাটা চোখে দিয়েই নীলের বাবা তার মাকে ডাকতে লাগলো,

--কই গো নীলের মা, দেখে যাও তোমার পাগল ছেলের কাণ্ড দেখে যাও।
(সন্তান আর বাবা মায়ের মধ্যে দূরত্বটা খুব সুক্ষ্ম, তবু পাহাড় সমান বিশাল মনে হয়। এক পা দুপা এগিয়ে গেলেই এই দূরত্ব কাটিয়ে ফেলা যায়)।

নিখিলের সাইকেল

মুসাররাত জামান
প্রভাষক
ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স

চলে যায় নিখিলের সাইকেল
বেল বাজিয়ে ক্রিং ক্রিং ক্রিং
তাকে ডাকো
তাকে ফেরাও
ফিরে দেখ নিখিল কবিরাজ
মারি ও মড়কের আবার সুদিন
আর আমাদের বন্ধদুয়ারে কড়ানাড়ে
মৃত্যুভয় প্রতিদিন
অতীতে তুমি ছিলে ঢাল তলোয়ার বিহীন এক অদম্য সৈনিক।

মনে পড়ে, চন্দ্রপুর গ্রামের মজিদমিয়ার ক্ষয়ে যাওয়া শরীর
কিনবা দিঘলীর ফুলনবিবির দেড় বছরের শিশুটাকে
কিভাবে ছিনিয়ে আনলে ওলাবিবির কাছ থেকে!
গ্রামের পর গ্রাম যখন উজাড় হত বসন্ত-কলেরায়
তোমার বৃদ্ধহাত দুটো তখন ছুঁয়ে যেত মানুষের অস্পৃশ্য দেহ
পরম মমতায়!
প্রাণ বাঁচানোর কি প্রাণপণ চেষ্টা!
তাই বুঝি তোমার কাছে মাঝেমাঝে হার মানত বসন্ত-ওলাবিবি?
তোমার কাঁধের ঝোলাটার ভিতর কী থাকত বলত?
কোনো তন্ত্র-মন্ত্র কিনবা মহৌষধতো নয়!
তুমি নাকি যন্ত্রণাকাতর মানুষের কানে কানে গিয়ে শোনাতে মোহমুক্তির গান?
আর সেই গানের সুরে ভেসে যেত জর্জর অভিশাপ
ভবিষ্যতের উন্নাসিক মানুষের দল তখন তোমাকে দেখে হেসেছে হো হো হো
তারা ভাবেনি তাদেরও একদিন নগ্ন হতে হবে
সত্যের সামনে
সভ্যতার মুখোশ খুলে গিয়ে অন্য মুখোশ সেঁটে যাবে বাঁচার তাগিদে
তাদের দাম্ভিকতা কামড়ে খাবে ক্ষুদ্র পরজীবী

পরজীবী আসলে কে? বলতে পারো নিখিল-
মানুষ বলে জন্ম নিয়ে যারা কীটের মত করে বংশবিস্তার
আহত পাখির শোকের গল্পটা শোনেনা
যারা পবিত্র বোধিবৃক্ষকে বধ করে
জ্বালায় বনাঞ্চল
পৃথিবী থেকে যারা সৌন্দর্য করেছে হরণ;
অবিশ্বাসের আগুনে পুড়ে বাজায় যুদ্ধের দামামা।

মানুষতো যুদ্ধে হেরে গেছে কবেই
যেদিন থেকে পুঁজিবাদ গেড়েছে আসন তার মস্তিষ্কে
রক্ত কণিকায়
মুনাফার জীবাণু তাই আজ চারদিকে ছড়ায়
ঘরেবন্দি ভয়ার্ত মানুষ কেউ কাওকে ছোঁয় না
প্রিয়জনকে হারিয়ে দিতে পারেনা বিদায়ি চুম্বন
মানুষের মায়াস্পর্শও এখন নিদারুন অপঘাত
তাই আজ তোমাকে চাই নিখিল কবিরাজ
তোমার জাদুকরি স্পর্শে যদি জেগে উঠে মানবতা
যদি একবার সেরে যায় মহামারী
বিশ্বাস যদি ফিরে আসে মানুষের মাঝে
চলে যেও না নিখিল কবিরাজ
আমাদের নশ্বর শরীরে একবার হাত রাখো।
চেতনার সাইকেলটিকে একবার ফেরাও!

প্রকৃতির সৌন্দর্যের খোঁজে

সুরভী আক্তার
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। যেমন আছে বিশ্বের অন্যতম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের একাংশ তেমনি আছে দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল। বাংলাদেশের সমতল প্রকৃতি যেমন সুন্দর একই সাথে ধাঁধানো সুন্দর বাংলার পার্বত্য অঞ্চল। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির বেশির ভাগই প্লাবন সমভূমির অন্তর্গত। বাংলার বেশিরভাগ মানুষ এই সমতল পরিবেশে অভ্যস্ত। এই সমতল পরিবেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগকারী মানুষের চোখ চায় একটু অন্যরকম স্বাদ। আর এই অন্যরকম স্বাদটাকে মেটাতে পাহাড়ী অঞ্চলের ঘন সুনিবিড় পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ একদমই উপযুক্ত।

একটি কথা প্রচলিত আছে, "Man can even die in search of beauty"। আমার বেলায় অবশ্য এই কথাটি কম খাটলেও, খাটে ঠিকই। আমি আমার জীবনে অনেক জায়গায় ঘুরেছি। অনেক কিছু দেখেছি। কিন্তু আমার এসব জায়গায় এত কিছু দেখার মধ্যে 'ভয়ংকর সুন্দর' কিছু পাইনি। কিন্তু বান্দরবানে গিয়ে আমার 'ভয়ংকর সৌন্দর্যের' খোঁজ সার্থক হল। সেন্ট মার্টিনে যাওয়ার সময় উত্তাল বঙ্গোপসাগরের ভয়ানক সৌন্দর্যও সত্যিই অতুলনীয়।

আমি বাংলাদেশের প্রায় সব পার্বত্য জেলায় গেছি। কিন্তু তখনো আমার বান্দরবানে যাওয়া হয়নি। বান্দরবানে যাওয়ার একটি সুযোগ আমি সবসময়ই খুঁজছিলাম এবং একদিন পেয়েও গেলাম। তখন আমি অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী। সবে জেএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। হাতে অঢেল সময়। ঘরে বসে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। চট্টগ্রাম শহরে আর কতো বেড়াব? এমনই একটা দিনে বাবা হঠাৎই আমাকে বলে, "চলো, কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক।" আমি ভাবলাম এবারও হয়তো কক্সবাজারে যেতে হবে। কিন্তু আমি বিস্ময়ে "থ!" হয়ে গেলাম যখন বাবা বান্দরবানে যাওয়ার কথা বললেন। আমার বড় ফুফু তখন আমাদের সাথে ছিলেন। বাবা বললেন পরদিন ভোরে রওনা দিতে হবে। আমাদের হাতে মাত্র ১ রাত সময় তাড়াহুড়ো করে ৩ দিনের কাপড় গুছিয়ে নিলাম আমরা। তার সাথে ক্যামেরাও নিলাম। পরদিন খুব ভোরে আমরা রওনা হলাম বান্দরবানের উদ্দেশ্যে। চট্টগ্রাম শহর ছাড়িয়ে ফটিকছড়ির রাস্তায় আসার পরই আমরা পাহাড় দেখতে শুরু করলাম। চারপাশের অসাধারণ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখতে দেখতে কখন যে বান্দরবানের খুব কাছে এসে পড়েছি, টেরও পাইনি। আমার সম্বিত ফিরে এলে যখন আমি দেখলাম আমরা অনেক খাড়া চড়াই এ আছি। এরকম অনেক খাড়া পাহাড়ী চড়াই উৎড়াই পার হয়ে আমরা বান্দরবান শহরের উপকণ্ঠে মেঘল রেস্ট হাউজে পৌঁছলাম।

মেঘল রেস্টহাউজ পাহাড়ের ওপর এক অসাধারণ সুন্দর জায়গা। সেখানে দো'তালার সর্বপূর্ব দিকের দু'টো কক্ষে আমাদের থাকতে দেয়া হয়। আমি আর আমার বড় ফুফু এক রুমে ছিলাম। রুম নম্বরটি আমার এখনো মনে আছে। রুম নম্বর ২১৪। মেঘল রেস্ট হাউজে বসেই আমরা ঠিক করে ফেলি কোথায় কোথায় যাওয়া যায়।

আমরা সকলে মিলে ঠিক করলাম আগে বান্দরবান শহরটি পুরো দেখব আর পরে শহরের বাইরে যাব। বান্দরবান শহরে যেসব দর্শনীয় স্থান আছে সেসব স্থানে আমরা সেদিন যাব বলে ঠিক করলাম। বান্দরবান শহরে দেখার মতো জায়গাগুলো হল-

* মেঘল পার্ক
* নীলাচল
* স্বর্ণমন্দির
* বান্দরবান শহর

আমরা সেদিন বিকালে স্বর্ণমন্দিরে যাই, স্বর্ণমন্দির পাহাড়ের উপর অবস্থিত এক অসাধারণ সুন্দর স্থান। সেখানে না গেলে বান্দরবান শহরে ঘোরাটাই- বৃথা হবে।

সেদিন বিকেলের পর আমরা আর কোথাও যাইনি। সোজা স্বর্ণমন্দির থেকে মেঘলে ফিরে আসি। পাহাড়ি অঞ্চলে রাত অনেক তাড়াতাড়ি নেমে আসে। তাই আমরা রাত ৮ টার মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। পরদিন সকালে খুব ভোরে উঠে আমি পাহাড়ী অঞ্চলে আমার প্রথম সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করলাম। এত সুন্দর দৃশ্য আমি এর আগে কখনো দেখিনি। সেদিন আমরা গেলাম শহরের বাইরে, চিম্বুক নীলগিরি-তে। সকাল ৭ টার দিকে আমরা প্রাতঃরাশ করে হেলিকপ্টারে করে চিম্বুকের উদ্দেশ্যে রওনা দেই।

প্রিয় পাঠক, আপনারা হয়তোবা ভেবে ফেলতে পারেন আমি আকাশ যানে করে চিম্বুকে গিয়েছিলাম। আসলে হেলিকপ্টার বলে ওখানকার গাড়িগুলোকে। আর বাসগুলোকে বলে 'চাঁদের গাড়ি'।

আমরা চিম্বুক পাহাড়ে পৌছাই সাড়ে আটটার দিকে। তখন চারপাশে অনেক গরম থাকলেও চিম্বুক পাহাড়ের ঠান্ডা বাতাস আমাদের অবস্থা খারাপ করে দিচ্ছিল। চিম্বুকের ওপর থেকে সাংগু নদী ও তার অববাহিকার বন-জঙ্গল অপার্থিব সুন্দর মনে হচ্ছিল। আমরা চিম্বুকে বেশিক্ষণ থাকলাম না কারণ আমাদের গন্তব্যস্থল নীলগিড়ির চূড়া। আমরা চিম্বুক থেকে ৯ টার দিকে রওনা হলাম। সেখান থেকে নীলগিরির দূরত্ব বেশি না হলেও নীলগিরিতে পৌছাতে গিয়ে আমাদের ১১টা বাজলো। নীলগিরিতে যাওয়ার রাস্তা অনেক সরু আর বন্ধুর। যাই হোক, বহু কষ্টে আমরা নীলগিরি শৃঙ্গে পৌছালাম। বর্ষাকালে নীলগিরি শৃঙ্গ থেকে মেঘ ধরা যায়। কিন্তু তখন শীতকাল ছিল বিধায় আমরা মেঘ ধরতে পারলাম না ঠিকই কিন্তু একরাশি ধুলো ধরতে পারলাম। নীলগিরি শৃঙ্গ তখন অনেক গরম ছিল কিন্তু এত গরমও আমাদের গায়ে লাগল না যখন আমরা নীলগিরি থেকে সমগ্র অর্থাৎ প্রায় সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম। এমন অসাধারণ দৃশ্য সত্যিই ভোলার নয়। নীলগিরি থেকে আমরা সাড়ে ১২টা নাগাদ বেরিয়ে পরলাম, উদ্দেশ্য মেঘলা রেস্ট হাউজ। নীলগিরি শৃঙ্গ সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়ে দেইঃ-

* নীলগিরি শৃঙ্গে রাতে থাকার জন্য কটেজ রয়েছে। দর্শনার্থী আগে থেকেই সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে রাতে থাকতে পারেন।
* যারা কটেজে থাকবেন তাদের জন্য রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থা আছে। সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য সেটি উন্মুক্ত নয়।
* নীলগিরিতে যাওয়ার উপযুক্ত সময় বর্ষকালে। তখন সেখানে দাঁড়ালে মেঘ ধরা যায়।

নীলগিরি থেকে আসার পথে আমরা "সহস্রপ্রপাত" দেখলাম। সহস্রপ্রপাতের উল্টোদিকেই পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রয়েছে চাকমাপল্লী। সহস্রপ্রপাতের সৌন্দর্য শীতকালে যতটা, বর্ষকালে তার থেকে ঢের বেশি। আমরা সহস্রপ্রপাতে বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। কারণ তখন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। সেদিন আর আমাদের দুপুরের খাওয়া হল না। আমরা সন্ধ্যা ছ'টা মেঘলে পৌছলাম। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। তাই রেস্ট হাউজ কর্তৃপক্ষ সেদিন রাতে বন ফায়ারের আয়োজন করে। পূর্ণিমার রাতে বন ফায়ারের পাশে রাতের খাবারের মজাই আলাদা। সেদিনের এই নৈশভোজ আমার আজীবন মনে থাকবে। আমাদের ভ্রমণের তৃতীয় এবং শেষ দিন আমরা সকালের নাস্তা সেরে একবারে আমাদের তল্পি-তল্পাসহ বেরিয়ে পড়ি। সেখান থেকে সরাসরি যাই "Resourceful Park" এ। পার্কটিতে পাহাড়ি ভেষজ উদ্ভিদ এবং পাখি দেখা যায়। সেখান থেকে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র হয়ে সরাসরি শহরে। ছিমছাম বান্দরবান শহরে আমরা তেমন কোথাও না গেলেও সরাসরি গেলাম প্যাগোডায়। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বুদ্ধের শয়ন মূর্তি সেখানে রয়েছে। আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছায় বান্দরবান থেকে আমাদের সেদিন দুপুর ১২ টায় রওনা দিতে হল। বান্দরবান বাংলাদেশের অন্যতম সুন্দর পাহাড়ী অঞ্চল।

বান্দরবানের মতো সুন্দর জায়গা না দেখে যে কেন মানুষ বিদেশে পাড়ি জমায়। এটাই বুঝি না। আমার একটি কবিতার লাইন খুব মনে পড়ছে-

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

আমাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় ছিল না বলে আমরা বান্দরবান-এর সব দর্শনীয় স্থান দেখতে পারিনি। কিন্তু আমার একটি অসম্পূর্ণ আশা রয়েছে। সেটি হল আবার বান্দরবানে যাওয়া। আমি আমার এই আশাটাকে একদিন পূরণ করব বলেই আশা করি। আমি বহু আগে বান্দরবানে গিয়েছি কিন্তু এর স্মৃতি ভোলার নয়। আমি মনে করি সবারই একবার বান্দরবানে যাওয়া উচিত। এতে তাদের দেখা সার্থক হবে। আর বিদেশে যেতে হবে না।

নারী তুমি কেমন

ফয়সাল আল ইসলাম
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব অর্থনীতি

নারী তুমি মানেই কি বঞ্চিত
নারী তুমি মানেই কি এক অসহায়ত্ব,
নারী তুমি মানেই কি নির্যাতিত ।

নারী তুমি কি নিশ্চুপ ফুলের কাঁটার মতো,
নারী তুমি কি সদা বাক্‌রুদ্ধ
নাকি তুমি অবুঝ শত কষ্ট ।

নারী তুমি স্নেহের নাম
নারী তুমি এক পরম শব্দ,
তুমি ভালবাসার স্নিগ্ধে ঘেরা চাদর ।

তুমি নারী এক মলিন হাসি,
তুমি মেঘের আড়ালে থাকা ঝমঝমে বৃষ্টি ।

নারী তুমি কোনো বস্তু নও
নও কোনো বাজপাখির চোখের শিকার,
নও কোনো হায়নার আকাঙ্ক্ষিত জগৎ।

নারী তো এক কোমল পুষ্পের মতো
নারী তো শুষ্ক মরুভূমির মাঝেও,
এক স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা ।

নারী তুমি ভিজে মায়ার মতো
তুমি শূন্য চরের বুকে
জেগে ওঠা মানবতার গৌরব ।

নারী তুমি আমার মা,
তুমি আমার বোন।
নারীকে আসো ভালবাসি
আসো শ্রদ্ধার ফুল দিয়ে,
তাদের আপন করি হৃদয় ও মায়ায়।

গবেষণায় হাতেখড়ি

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র ছিলাম তখন সাধারণত দেখতাম শিক্ষকরাই গবেষণা করতেন। আমরা ছাত্রছাত্রীরা শেষ বর্ষে এসে কিছু গবেষণা করার সুযোগ পেতাম। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমাদেরকে গাইড করতেন কিভাবে গবেষণাটা আসলে করতে হয়। তখন স্নাতক পর্যায়ে গবেষণাটা শেখাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। একটা গবেষণা কিভাবে শুরু করতে হয়, কোন কোন অংশ নিয়ে একটা থিসিস অথবা প্রজেক্ট রিপোর্ট লেখা যায় তাই আমরা মূলত শিখতাম। খুব ভাল কাজ হলে কেউ কেউ তার রিপোর্ট থেকে কোন দেশীয় অথবা খুব সাহস হলে আন্তর্জাতিক জার্নালে জমা দিতেন বিবেচনার জন্য। অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে ওটা প্রকাশিত হতে হতে তাঁর হয়ত স্নাতকোত্তর পার হয়ে যেত, অথবা তিনি কোন চাকুরীতে ঢুকে যেতেন।

একটা ভাল গবেষণা করে তা কোন ভাল জার্নালে প্রকাশ পেলে যে কি পরিমাণ ভাল লাগা কাজ করে তা শুধু মাত্র যারা করতে পারেন, তাঁরাই জানেন। আর তা যদি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রাবস্থাতেই। হ্যাঁ, আমি যদি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি, অথবা বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করি তাহলে এটা অবশ্যই সম্ভব। বর্তমানে অনেক ছাত্রছাত্রীরাই স্নাতক পর্যায়েই গবেষণায় হাতেখড়ির সাথে সাথে ভাল আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর কাজ প্রকাশ করছেন। আমি এমন ছাত্রছাত্রী দেখেছি, তিনি স্নাতক শেষ করেন নাই, অথচ তাঁর ঝুলিতে এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই কয়েকখানা স্বনামধন্য স্কোপাস ইনডেক্স ভুক্ত জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধ রয়েছে।

স্নাতক পর্যায় থেকেই কিভাবে ছাত্রছাত্রীরা গবেষণায় সাফল্য পাচ্ছে? আমার ছাত্রজীবন, গবেষণার সময় এবং শিক্ষক হিসাবে সময়টা যদি বিবেচনা করি, তাহলে অনেক ছাত্রছাত্রীকেই দেখেছি গবেষণায় কাজ করার আগ্রহ থাকে। তবে এই আগ্রহটা প্রবল আগ্রহ বলা যায় না অনেকের ক্ষেত্রেই। অনেকেই প্রথম দিকে খুব আগ্রহ দেখান গবেষণা করার জন্য, কিন্তু কাজ করতে গেলে আর করতে চান না অথবা পারেন না। গবেষণার যে কাজগুলো করতে সময় এবং মেধা ব্যয় করতে হয়, বিশেষ করে লিটারেচার রিভিউ, তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করার সময় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। অনেকেরই হয়ত খুব একটা ভুল ধারনা আছে, গবেষণা খুব সহজ একটা ব্যাপার। আমি যখন উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপ এবং জাপানে ছিলাম, তখন দেখেছি গবেষণার জন্য কি পরিমাণ টাকা, সময় এবং মেধা ব্যয় হয়। আর যিনি গবেষণা করছেন, তিনি আর অন্য কোন কিছু চিন্তা করতে পারছেন না। জাপানে শেষ বর্ষে এসে ছাত্রছাত্রীদের একটা ল্যাবে যুক্ত হয়ে গবেষণা করতে হয়। শেষ দিকে এসে তাঁরা খুব কমই ঘুমাতে পারতেন। সারা রাত ল্যাবে কাজ করে যখন আর পারতেন না, একটু ঘুমিয়ে নিতেন (আমি বলব জিরিয়ে নিতেন), এরপর আবার কাজ করতেন। ল্যাবে কাপ নুডুলস রেখে দিতেন, অনেক রাতে খাওয়ার দরকার হলে খেতেন, যেন কোথাও সারভাইভাল মিশনে আছেন।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলি, কোন গবেষণা (তা হোক সোস্যাল সাইন্স অথবা ন্যাচারাল সাইন্স অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং) শুরু করার আগে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে আগ্রহ এবং ইচ্ছাশক্তি। আমি যে গবেষণা করতে চাই, এটা করার জন্য আমার আগ্রহ কতটুকু প্রবল। গবেষণায় যে বাঁধাগুলো থাকবে (সময়, মেধা এবং টাকা ব্যয় করা) তা আমার ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকলে অতিক্রম করা সম্ভব।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, আমরা অনেকেই খুব অস্থির হয়ে যাই যেন তেন ভাবে গবেষণা শেষ করার জন্য। এর জন্য আমরা অনেকেই নীতিবিরুদ্ধ (যেমন অন্যের কাজ উদ্ধৃত না করেই নিজের কাজের অংশ করে ফেলা, সঠিক ভাবে তথ্য না সংগ্রহ

করে মিথ্যা তথ্য দেয়া, নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে করান ইত্যাদি) কাজ করে ফেলি যা একাডেমিক পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলে, এবং এগুলো করা অপরাধ, কিছু ক্ষেত্রে চরমতম অপরাধ। তিনি নিজেরও ক্ষতি করে ফেলেন, তিনি হয়ত সেই গবেষণা দেখিয়ে কোন এক ডিগ্রী নিয়ে ফেলেন, কিন্তু গবেষণাটা আর শিখতে পারেন না। তাঁর কাছে তখন ধারনা হয়ে যায় গবেষণা মনে হয় এভাবেই করে, তিনি গবেষণার জন্য যে সময়, মেধা এবং টাকা ব্যয় করতে হয়, তা আর করতে চান না। তাঁর কাছে গবেষণার সেই সম্মান আর একটা কিছু জয় করার অফুরন্ত আনন্দটাও আর থাকে না, পানসে মনে হয়।

আমার যদি আগ্রহ এবং ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকে কোন গবেষণার জন্য তাহলে আমি ঐ গবেষণার জন্য যা যা শেখা এবং করা প্রয়োজন তা আমি করতে পারব। আমার সিলেবাস এ সবকিছু হয়ত থাকবে না। স্নাতক পর্যায়ের জন্য যতটুকু দরকার তাই হয়ত থাকবে। কিন্তু আমি গবেষণা করে ভাল জার্নালে প্রকাশিত করতে চাইলে অবশ্যই অনেক কিছুই নিজে থেকে শিখতে হবে। এই যেমন রিসার্চ মেথডলোজি বিষয়টা মোটামুটি প্রায় সবাইকেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়তে হয়, যেখানে একজন স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী গবেষণাটা কি, কেন করা উচিৎ এবং কিভাবে করা যায় তাই শেখেন। তবে মূল উদ্দেশ্য থাকে গবেষণা করতে গেলে যে বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন তাই শেখা। তবে এই ছাত্রছাত্রী যখন উচ্চ পর্যায়ে গবেষণা করতে চান তখন নিজে থেকে তাঁকে অনেক কিছুই শিখতে হয়। বর্তমান ইন্টারনেট এর যুগে সব কিছুই আমরা অনলাইনে পেতে পারি। কোভিড-১৯ মহামারীতে ইন্টারনেটের প্রয়োজনীয়তা আরও প্রবলভাবে উপলব্ধি হয়েছে। আমার যদি কোন কোর্স অথবা কোন সফটওয়্যার শেখার ইচ্ছা থাকে, আমার সিলেবাসে না থাকলেও আমি তা অনলাইনে শিখে নিতে পারি। ইউটিউব এ অনেক কিছুই আমি বিনামুল্যে পেতে পারি। এছাড়াও আমি কিছু টাকা ব্যয় করে কোর্সএরা, উডেমি ইত্যাদি অনেক ওয়েবসাইট থেকে শিখে নিতে পারি। এটা সম্ভব, আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি অবশ্যই সম্ভব। তবে সেলফ স্টাডির জন্য প্রবল আগ্রহ এবং সদিচ্ছা দরকার। আপনার গবেষণার জন্য প্রবল আগ্রহ এবং ইচ্ছাই আপনাকে সাহায্য করবে। বর্তমান ডিজিটাল যুগে আমরা সফটওয়ার/প্রোগ্রাম দিয়ে সবকিছুই সহজভাবে করার চেষ্টা করি। বর্তমানে এমন কিছু টুলস (সফটওয়ার/প্রোগ্রাম) আছে যা গবেষণাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এই যেমন, আমি যখন ছাত্র ছিলাম, সাইটেশন এবং রেফারেন্সিং ছিল খুবই কষ্টের কাজ। রেফারেন্সিং করা, এক রেফারেন্স স্টাইল থেকে আরেক রেফারেন্স স্টাইলে পরিবর্তন করা ছিল গবেষণার সব থেকে বিরক্তিকর কাজ। এর জন্য প্রচুর সময়ও ব্যয় হয়। এখন রেফারেন্স করা হচ্ছে খুবই সহজ (কেউ কেউ বলেন তুড়ি মেরে কাজ করে ফেলা) কাজ। শুধু জানতে হবে রেফারেন্স ম্যানেজমেন্ট টুল। অনেক রেফারেন্স ম্যানেজমেন্ট টুল আছে যেমন মেন্ডেলি, যোটেরো, এন্ডনোট ইত্যাদি। এগুলোর ভেতর কিছু একদম বিনামুল্যে ব্যবহার করা যায়। নতুন সাইটেশন এবং রেফারেন্সিং করা, অথবা এক রেফারেন্স স্টাইল থেকে আরেক রেফারেন্স স্টাইলে পরিবর্তন করা যায় খুব সহজে এবং কম সময়ে, যা ম্যানুয়ালি করতে কয়েক ঘন্টা লাগতে পারে। আর এগুলো শিখতে গেলে আপনার অনেক সময় ব্যয় হবে না, প্রতিটার সাথে টিউটোরিয়াল থাকে যা দেখে আপনি খুব সহজেই শিখে নিতে পারবেন কিভাবে এগুলো ব্যবহার করা যায়। এগুলো এমনভাবে বানানো হয়েছে (আমরা বলি ইউসার ফ্রেন্ডলি) যেন আপনি খুব সহজেই শিখে নিতে পারেন। আপনি আপনার যে কোন ধরনের রিপোর্ট লিখতে গেলে এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। যত বেশি বেশি ব্যবহার করবেন ততই দেখবেন ঐ টুলগুলো কত আয়ত্তে আসছে। আমরা বলি পোষ মানানো।

আপনি যদি টুলটিকে একটা বিড়াল অথবা আপনার প্রিয় কোন পশু/পাখি ভাবেন যা আপনি পোষ মানাতে চান, একে যত সময় দিবেন ততই আপনার আয়ত্তে আসবে, আপনার কথা শুনবে, আপনি ওকে বুঝতে পারবেন। তেমনি যে কোন টুলকে আপনি যত সময় দিবেন, এটা নিয়ে যত নাড়াচাড়া করবেন, ততই আপনি বুঝতে পারবেন কি করলে এটা আপনার কথা মত কাজ করবে। আর এগুলো যখন করতে পারবেন, দেখবেন কত সহজ হয়ে গিয়েছে আপনার গবেষণার কাজ।

আর একটা ব্যাপার অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। একজন মেন্টর আপনি খুঁজে নিবেন, তিনি হতে পারেন আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাই, অথবা আপনার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অথবা অন্য যে কেউ যার গবেষণা সম্পর্কে ধারনা আছে। আপনি তাঁর কাজে সংযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন। তবে অবশ্যই আপনার উপর তাঁর আস্থা বাড়াতে হবে। মনে রাখবেন যে গবেষণার জন্য কিছু ব্যাপার অবশ্যই আপনার মধ্যে থাকতে হবে অথবা না থাকলে আয়ত্তে আনতে হবে, তা হল অসীম ধৈর্য আর হাল ছেড়ে না দেয়ার মানসিকতা। আপনি বারবার ব্যর্থ হবেন আপনার গবেষণার আশাযোগ্য ফলাফল পেতে, অথবা আপনি আপনার গবেষণার ফল নিয়ে আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগছেন, কিন্তু দেখবেন অন্যরা (হতে পারে আপনার সম্মানিত সুপারভাইজর অথবা জার্নালের এডিটর অথবা রিভিউয়ার) আপনার কাজকে মনে করছেন না সঠিক। আপনি বারবার প্রত্যাখ্যাত হবেন, কিন্তু হেরে যাওয়া যাবে না, আপনাকে অসীম ধৈর্য নিয়ে পুনরায় কাজ করে যেতে হবে, নতুন উদ্যমে। আপনাকে চর্চা করতে হবে গবেষণা নিয়ে। যতই চর্চা করবেন ততই শিখবেন। দেখবেন আপনি গবেষণাটা আয়ত্তে আনতে পারছেন, আপনার ভাল লাগছে। শুভ কামনা আপনার জন্য।

সন্ধান

তাসনুভা রহমান লাবিবা
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি

ট্রেন ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছুঁয়ে দাঁড়াতেই শুরু হয়ে গেলো হুড়োহুড়ি। যাত্রী নামার আগেই আরেক দল ট্রেনে ওঠার জন্য ব্যস্ত। এত ভিড় ঠেলে নামাটাই ঝক্কি। কিন্তু উপায় নেই। নামতেই হবে। শক্ত হাতে ট্রলি ব্যাগটা ধরে রেখে কোনোরকমে নেমে এলো নীরা। এর আগে নিজের শহর ছেড়ে বাইরে তেমন একটা যাওয়া হয়নি তার, তাই কিছুটা ঘাবড়ে আছে। ষ্টেশনে ভীড় ক্রমশ বাড়ছে এখান থেকে বেরোতে হবে তাছাড়া সন্ধ্যা নামবে একটু পরে। কিছুদুর এগিয়ে হাতের ব্যাগ থেকে একটা ঠিকানা বের করলো। ১৩ নাম্বার মুন্সী সরণী। কিন্তু এখন ১৩ নাম্বার মুন্সী সরণী গেলে চলবে না। নীরাকে যেতে হবে তার বান্ধবীর বাসায়। এই শহরে নীরা এসেছে ৭ দিনের জন্য। ৭ দিনে তাকে তার জীবনের বিশেষ একটা কাজ করতে হবে। নীরা এখন যার বাসায় যাচ্ছে সে এই শহরে একমাত্র নীরার পরিচিত। নীরার বিশ্ববিদ্যালয়ের বান্ধবী। বিশ্ববিদ্যালয় একটা মজার জায়গা। একটা ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে পুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গার মানুষ দেখা যায়। অবশ্য, সবকিছু ঠিক থাকলে এই শহর হতে পারতো নীরার সবথেকে চেনা শহর। এইসব ভাবতে ভাবতেই নীরা পৌছে গেলো তার বান্ধবীর বাড়িতে। সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে। কলিং বেল এ টিপ দিতেই রিফা এসে দরজা খুলো।

রিফা-- আরে খুব জলদি চলে এলি তো।
নীরা-- হ্যাঁ তোদের শহরে ঢাকার মত জ্যাম নেই।
রিফা-- তা ঠিক। আমি চিন্তা করছিলাম বাসা চিনে আসতে পারবি কিনা, ভাইকে পাঠাতে চাইলাম রাজি হলি না।
নীরা-- রাজি না হওয়ার কারণ এই শহরটা আমি একাই চিনতে চাচ্ছি।
রিফা-- কি ব্যাপার বল তো। তোর বিজি লাইফ থেকে সময় বের করে হঠাৎ এই শহর চেনার শখ হলো যে?
নীরা-- নিউইয়র্ক এ যাওয়ার আগে একটা মানুষের মুখোমুখি হতে চাচ্ছি।
রিফা-- কে সে? আগে তো বলিসনি কখনো!
নীরা-- যদি তার সাথে আমার সত্যি দেখা হয় তাহলে বলবো।
রিফা-- ঠিক আছে রেস্ট নে।

আগামী ৭ দিন নীরা রিফার বাড়িতেই থাকবে। এখন নীরার প্রধান কাজ হচ্ছে এই ৭ দিনের একটা প্লান বানিয়ে ফেলা। বলা যায় যে, দীর্ঘ ১৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে নীরা একা একা অনেক প্লান বানিয়েছে, নিজে নিজে অনেক কিছু ভেবেছে কিন্তু তাও ৭ দিনের একটা প্লান বানাতে হবে যাতে সে যে উদ্দেশ্যে এই শহরে এসেছে তা পুরোপুরিভাবে সফল হয়। রিফার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে এখান থেকে মুন্সী সরণি কতদূর। নীরা শুধু রোডের নামই জানে ওই রোডের কোন বাড়িতে সে থাকে এটা তাকে খুজে বের করতে হবে। কালকের সকাল থেকেই খুঁজতে হবে।

পরদিন সকালে নীরা বেড়িয়ে পড়লো রিফাকে নিয়ে মুন্সী সরণিতে সেই বাড়ির খোঁজে। কাউকে জিজ্ঞেস করবে কিনা এটাও বুঝতে পারছে না।

রিফা-- কাকে খুজছিস বল তো?
নীরা-- খুঁজে পেলে বলবো।
রিফা-- তুই এভাবে কোনদিন খুঁজে পাবি না। এত বাড়ির মধ্যে কোন বাড়িতে তোর সেই মানুষ আছে এটা কি বোঝা সম্ভব?

তোকে অবশ্যই যাকে খুজছিস তার নাম বলে খুজতে হবে।
নীরা-- আচ্ছা আজ বরং চল কালকে আবার খুঁজবো।
রিফা-- আচ্ছা চল। কি পাগলামি শুরু করলি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি।

৭ দিনের একদিন কেটে গেলো আজ। নীরার কি উচিৎ রিফাকে সবটা বুঝিয়ে বলা। যাতে সুবিধা হতো খুঁজতে? নীরার হাতে সময়ও খুবই কম। কাল নাম বলেই খুঁজবে। নীরার মাথায় হাজারটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। যদি দেখা হয়েই যায় কি বলবে দেখা হওয়ার পর? আর যদি দেখা না হয় তাহলেই বা কি করবে?! এইসব ভেবেই ঘুমিয়ে পড়লো। খুব বাজে ধরনের একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠে বসলো নীরা। তখন ভোর ৫টা। অতীত তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাকে। তার ঐ মানুষটার মুখোমুখি না হলে আজীবনের মত আফসোস থেকে যাবে। আরও একদিন কেটে গিয়েছে। আজ খুঁজেছিলো নাম ধরেই। বাড়িটাও পাওয়া গিয়েছে। ২ তলা একটা বাড়ি। কিন্তু তাতে নিরাপত্তার শেষ নেই। আজ আর দেখা হবে না। নীরাকে আসতে হবে কাল বিকেল ৫টায়। নীরা মনে মনে খুশিই হলো যাক একটা দিন। পাওয়া তো গেলো। এইবার সে সব গুছিয়ে নিতে পারবে, দেখা হলে কি বলবে এটা সে গুছিয়ে নিচ্ছিলো আরও ১৮ বছর আগ থেকেই কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে যেন ঘাবড়ে যাচ্ছে।

পরদিন সকাল,
নীরা তার মায়ের কাছ থেকে চেয়ে শাড়ী এনেছিলো আজকের এই বিশেষ দিনে পরবে বলে। আজকের সেই শাড়ীটাই পড়লো। আয়না তাকিয়ে আছে নিজের দিকে। মায়ের ছবি দেখে মায়ের মত করে সেজেছে সে।
রিফা-- আরে! তোকে তোহ একদম আন্টির মত লাগছে।
নীরা চমকে উঠলো। আসলেই তাহলে তাকে তার মায়ের মত লাগছে।
রিফা-- কিরে, কথা বলছিস না কেন? কার সাথে দেখা করতে যাচ্ছিস বল তো। হুবহু আন্টির মত করে কেনো সেজেছিস?
নীরা-- একজনকে তার পুরনো অতীত মনে করিয়ে দিতে।

রিফা-- আসার পর থেকে কিসব বলিস আমি কিছুই বুঝতে পারি না। যাই হোক, যেতে তো সময় লাগবে, ৫টা বাজতে চললো প্রায়। বের হই চল।
নীরা-- যাচ্ছি চল
নীরা মনে মনে ভাবছে মাকে একবার জানাবে কিনা। এখানে সে এসেছে মাকে না বলেই। মাকে বললে হয়তো আসতেই দিত না। থাক, ফিরে এসে জানাবে এটা ভেবে বেরিয়ে পড়লো।

১৩ নাম্বার মুন্সী সরণির বাড়িটার নাম "নীরাঞ্জনা"। নীরা এখন নীরাঞ্জনার সামনে দাড়িয়ে আছে। বুক ধুকপুক করছে। কপালে ঘাম জমছে। শাড়ী পড়ার ভালোই অভ্যাস ছিলো কিন্তু আজ কেন জানি বার বার হোঁচট এর মত খাচ্ছে।
নীরা বসে আছে হোসাইন মুহাম্মদ এর সামনে। কিন্তু হোসাইন মুহাম্মদ তাকাচ্ছেন না, তাকিয়ে আছেন উল্টো দিকে মুখ করে। এখনো নীরাকে দেখেননি। না দেখেই জিজ্ঞেস করলেন।

হোসাইন মুহাম্মদঃ তা নাম কি আপনার?
নীরাঃ আমার নাম নীরা, নীরাঞ্জনা।
হোসাইন মুহাম্মদ চুপ করে রইলেন আনুমানিক ১ মিনিট সময় নিলেন পিছনে ফিরতে। পিছনে ফিরেই দাঁড়িয়ে পড়লেন।
হোসাইন মুহাম্মদঃ অবিকল সেই এক চেহারা। সেই একই শাড়ী পড়ার স্টাইল, চুল বাধা সবকিছু। নীলা তাহলে আমার দেয়া নামটা পাল্টে ফেলেনি।
নীরা মুচকি হেসে বল্লো।
আপনি বুঝি এটাই চেয়েছিলেন? তাহলে ষোলকলা পূর্ণ হতো বলুন।
হোসাইন মুহাম্মদঃ অনেক বড় হয়ে গেছ। আমি তোমাকে শেষ দেখেছি তখন তোমার ২ বছরের মত বয়স। তুমি ঘুমাতে আমার বুকের উপর।
নীরাঃ হ্যাঁ। এরপর আমার ঘুমাতে কিছুদিন সমস্যা হয়েছিলো। মা বলেছে আমি কোলবালিসকে আপনি ভেবে ঘুমাতাম।
হোসাইন মুহাম্মদঃ তুমি কি আমাকে একবার "বাবা" বলে ডাকতে পারবে? শুধু একবার।
নীরাঃ না। বিশ্বাস করুন "বাবা" ডাকার জন্য আমি অপেক্ষা করেছি বছরের পর বছর। আয়নার সামনে গিয়ে অনেকবার বলেছি।

কিন্তু আজ আপনার সামনে দাড়িয়ে মনে হচ্ছে-
না আমি বাবা ডাকবো না। যেই ডাকটা ডাকার জন্য আমাকে ১৮ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। আপনি আজ থেকে অপেক্ষা করবেন আজীবনের জন্য বাবা ডাক শোনার।

৭ দিন পেরোবার আগেই চলে যাচ্ছে নীরা। তার জীবনের অনেকগুলো উদ্দেশ্যর মধ্যে বাবার সাথে দেখা করাও লিস্টে ছিলো। আর কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন ছেড়ে দিবে। হোসাইন মুহাম্মদ এখনো এসে পৌছাননি। কথা দিয়ে না রাখার অভ্যাস তার আছে। তাও কেনো জানি নীরা অপেক্ষা করছে। মনে মনে বলছে এই অপেক্ষাটার শেষ যেনো না হয়।

ট্রেনের হুইসেল দিয়ে দিলো। এর মধ্যে নীরার চোখে পড়লো হোসাইন মুহাম্মদকে। তিনি হয়তো নীরাকে দেখতে পাচ্ছেন না। নীরা তাকে কি বলে ডাকবে? বাবা বলে ডাকবে একবার? ট্রেন ছেড়ে দিলো, নীরা এক দৌড়ে ট্রেনের দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বল্লো,

"বাবা, বাবা, বাবা"
হোসাইন মুহাম্মদ তাকালেন। ট্রেন ছুটে চলছে তিনিও যাচ্ছেন ট্রেনের পিছু পিছু। নীরা আবার বল্লো,
"বাবা, আমি চলে যাচ্ছি আপনি ঠিকভাবে থাকবেন।"
হোসাইন মুহাম্মদ একহাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে দৌড়াচ্ছেন। কেনো দৌড়াচ্ছেন তিনি জানেন না। হয়তো মেয়ের মুখে আরেকবার "বাবা" ডাকটা শোনার জন্য।
নীরা আর ডাকতে পারছে না, তার গলা ধরে এসেছে। চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে পানিতে।
ট্রেন তার নিজের মত ছুটে চলছে।

উত্তরাধুনিকতা

আব্দুল্লাহ আল মাদানী
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ

উত্তরাধুনিকতা প্রজন্মের মানুষ আমি
আমার চিন্তায়, মননে-মগজে তার সক্রিয় আবাস
ইদানিং মনে হচ্ছে তার মধ্যে ফানা হয়ে যাচ্ছি
সবকিছুর বিরুদ্ধে আমাকে আঙ্গুল তোলা শিখিয়েছে সে, ক্ষেপিয়ে তুলেছে
সন্দেহ করো, প্রশ্ন করো, কোনো কিছুই ধ্রুব নয়।

আজকাল নিজের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর বিপ্লবীর অস্তিত্ব টের পাই আমি
পৌনে দশমাসের ভ্রূণের মতো মনে হয় তাকে, এই বুঝি আমাকে ফেড়ে বের হয়ে আসছে
জগতের কোনো কিছুরই কুছ পরোয়া নেহি
সমাজ, মানুষের মৌলিক বোধ; চিরন্তন কিছুই নয়, বিমূর্ত। বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাও।

এইতো কিছুদিন আগে খবর পড়তে পড়তে তার পূর্বপুরুষের সাথে আলাপ হচ্ছিলো
পূর্বাধুনিকতা? না না, কেবলই আধুনিকতা।
যে জীবনকে উপভোগ করার জন্য একটা রঙ্গিন চশমা উপহার দিয়েছে আমাকে
চিরাচরিত ধূসরতা ছেড়ে চশমা লাগাও একটু, তারপর যে রঙ্গে খুশী জীবনকে উপভোগ করো।

উন্নয়নের সংজ্ঞা শিখিয়েছে আমাকে সে
যতো টাকা ততো উন্নয়ন।

পড়ছিলাম, মাথাপিছু জিডিপি বেড়েছে দেশের, তারমানে উন্নতি ঘটেছে আমার।

প্রশ্ন করলাম তাদের দুই কুশীলবকে: আমার শান্তি বেড়েছে? অভাবী কমেছে? বেড়েছে তাদের প্রতি
আমার দায়বোধ? আমার অস্তিত্বে আসার মাধ্যমদের প্রতি বেড়েছে আমার ভালোবাসা? ওল্ডহোম কেন
বাড়ছে? স্রষ্টা থেকে দূরেই বা কেন সরে যাচ্ছি আমি?

নিশ্চুপ দুয়ের এক উত্তরাধুনিকতাই মুখ খুললো- চোয়াল শক্ত করে উত্তর দিলো: তুমি নিয়ত পরিবর্তনশীল, ভাসমান।
কোনো কিছু আঁকড়ে থাকা সাজে না তোমার, দায়বদ্ধ না তুমি কিছুর প্রতি।
তুমি তুমিই।

-হ্যাঁ, আমি আমিই। ঘড়ের কুটো। তোমার কালের মানুষ আমি। উত্তরাধুনিকতা প্রজন্মের মানুষ আমি।

জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা এক অনুকরণীয় সংস্কৃতি

তাহমিনা সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ

একজন শিক্ষার্থী ছোট বেলায় যে শিক্ষা গ্রহণ করে, যে সংস্কৃতি ধারণ করে, পরবর্তীতে তার জীবনে সেই শিক্ষা বা সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান থাকে। ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধ গঠন করতে বাল্যকালের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেকাংশেই দায়ী। বাল্যকালে একটি শিশু সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় যেখানে সে বেশি অবস্থান করে, সেখানকার পরিবেশের অবস্থার উপর। তাই বলা যায়, পরিবেশ ও সংস্কৃতি দ্বারা একজন শিশু সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। বিদ্যালয়ে পাঠদান গ্রহণকালে যেসব সংস্কৃতির চর্চা ও অভ্যাস গঠন যদি সময়োপযোগী ও অনুকরণশীল হয়ে থাকে তবে তা পরবর্তীতে সমাজগঠনে তথা দেশগঠনে সাহায্য করে। জাপানে এক অনুকরণশীল শিক্ষার সংস্কৃতি বিদ্যমান। এই শিক্ষার যথেষ্ট প্রভাব তাদের পরবর্তী জীবনে প্রবাহমান।

পঠিত বিষয়সমূহ

আমরা জানি জাপানের অপরাধ প্রবণতার মাত্রা একদমই কম। এই সুন্দর সমাজব্যবস্থার ভিত্তি মূলত স্কুলগুলো যেখানে শিক্ষার্থীরা জীবনমুখী শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। সেখানে বিভিন্ন বিষয় যেমন গণিত, ইতিহাস, শরীরচর্চা, সংগীত, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান পড়ানো হয় তেমনি শিখানো হয় নৈতিকতা, সামাজিকতা, ন্যায়-অন্যায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। এছাড়া এসব ক্লাসের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে আরও কিছু বিশেষ ক্লাস ও সমন্বিত পাঠ্যক্রমেও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করতে হয়।

জাপানের ক্লাসরুম (সূত্র: ইন্টারনেট)

বয়স অনুযায়ী শ্রেণি

জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা মূলত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, যেমন কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ৩-৫ বছর, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬-১১ বছর, জুনিয়র হাইস্কুল/মিডল স্কুলে ১২-১৪ বছর এবং সিনিয়র হাইস্কুলে ১৫-১৭ বছরের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ভোকেশনাল স্কুল ২-৪ বছর মেয়াদি হয়। তবে জাপানে প্রাথমিক বিদ্যালয় আর জুনিয়র হাইস্কুল হচ্ছে বাধ্যতামূলক শিক্ষার পর্যায় এবং সেখানে সরকারি এবং বেসরকারি দুই ধরনের প্রাথমিক স্কুল বিদ্যমান।

বিদ্যালয়ের পোশাক

প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীরা এক ধরনের টুপি পরিধান করে এবং 'রানদোশেরু' নামক এক ধরনের ব্যাগ ব্যবহার করে যাতে শিক্ষার্থীরা বই রাখে। এই ব্যাগটি দেখতে বর্গাকারের ও একটু বাঁকানো, কঠিন ও বেশ মজবুত। এই ব্যাগটি নানান রঙের হয়ে থাকে। এছাড়া টুপিও একেক স্কুলের জন্য আলাদা রঙের এর হয়ে থাকে। ছেলে ও মেয়েরা ব্যাগ পিঠে বহন করে স্কুলের পথে হেঁটে যায়। ক্লাসরুমের জন্য তাদের ভিন্ন জুতা পরিধান করে ক্লাসরুমে প্রবেশ করতে হয় যা তারা স্কুলে আসার পর পরিধান করে থাকে।

'রানদোশেরু' নামক এক ধরনের ব্যাগ (সূত্র: ইন্টারনেট)

প্রতিটি শ্রেণির সময়কাল/ব্যাপ্তি

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিশুরা সপ্তাহে ৫দিন তথা সোমবার থেকে শুক্রবার ক্লাস করে এবং প্রতিটি ক্লাসের জন্য নির্ধারিত সময় ৪৫ মিনিট। প্রতিটি ক্লাসের মাঝে ১০-১৫ মিনিট বিরতি থাকে। প্রতিটি ক্লাসে ৩০-৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকে। একদিনে সর্বোচ্চ ৬টি ক্লাস হয়। ক্লাসে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে শিক্ষাদানে শিক্ষকগণ সদা সচেষ্ট। টিফিনের আগে ৪টি ক্লাস, টিফিনের পরে ২টি ক্লাস হয়ে থাকে। সংগীত আর শিল্পকলা এবং শারীরিক শিক্ষার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক থাকেন। বিশেষ ধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা ক্লাসরুমের ব্যবস্থা রয়েছে। কোনো ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়ায় ভালো না করলে তাকে সেই বিশেষ রুমে আলাদাভাবে যত্ন নিয়ে পড়ানো হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যর্থনা

শিক্ষা জাপানি সংস্কৃতির একটি মূল্যবান অংশ। জাপানে শিক্ষকদের ভাল বেতন দেওয়া হয় এবং তাদের খুব সম্মানের সাথে দেখা হয়। দিনের শুরুতে প্রধান শিক্ষক সবার আগে স্কুলে আসেন। তিনি স্কুল গেটে দাঁড়িয়ে সব ছাত্র-ছাত্রীকে অভ্যর্থনা জানান। শিক্ষার্থীরা স্কুলে ঢুকে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। জাপানি সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিবিড়ভাবে সমর্থন করে এবং জাপানি পিতামাতাগণ তাদের সন্তানদের শিক্ষার সর্বোত্তম সুযোগ প্রাপ্তি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

খাদ্য গ্রহণ

জাপানের প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দুপুরের খাবার বিদ্যালয় থেকে পরিবেশন করা হয়। খাদ্য তালিকা এবং খাবারের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একজন পুষ্টিবিদ থাকেন। পুষ্টিবিদ বাচ্চাদের কোন খাদ্যের কতটুকু ক্যালরি প্রয়োজন তা হিসাব করে সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করেন। এই খাদ্য তালিকা অনুসরণ করে দক্ষ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাবুর্চিরা খাবার রান্না করেন। এমনকি শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীদের সাথে ক্লাসে খাবার খায়। প্রত্যেকটি স্কুলে নিজস্ব রান্নাঘর রয়েছে। দুপুরের খাবারের সময় ছাত্র-ছাত্রীরা সংগীতের তালে তালে খুব আনন্দের সঙ্গে বিশেষ ধরনের পোশাক পরে সারিবদ্ধভাবে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রেণি অনুযায়ী নিজেদের উপস্থিতির জানান দেয়। তখন রান্নাঘরের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিগণ তাদের খাবার বুঝিয়ে দেন। খাবার নিয়ে ক্লাসে ফিরে ছাত্র-ছাত্রী নিজেরাই খাবার পরিবেশন করে। খাবার গ্রহণের শুরুতে ও শেষে শিশুদের জানানো হয়, তারা কি খাচ্ছে এবং কেন খাচ্ছে ইত্যাদি। শেখানো হয় যিনি খাদ্য রান্না করেছেন তার প্রশংসা কীভাবে করতে হয়। খাবার গ্রহণের শুরুতে ও শেষে শিশুরা প্রার্থনা করে। খাবার গ্রহণ শেষ হলে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করে আবার শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। স্কুলে খাদ্যগ্রহণ করার জন্য রয়েছে সুন্দর ব্যবস্থাপনা। খাবার গ্রহণের আগে ও পরে যাতে শিশুরা হাত ধুতে পারে তার জন্য প্রতিটি ক্লাসরুমে এবং ফ্লোরে রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। বেসিন ও পানির ট্যাপগুলো শিশুদের বয়স বিবেচনার উপর ভিত্তি করে বসানো হয়।

শিক্ষার্থীরা নিজেরাই খাবার পরিবেশন করছেন (সূত্র: ইন্টারনেট)

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একসাথে খাবার গ্রহণ (সূত্র: ইন্টারনেট)

খেলাধুলায় অংশগ্রহণ

ক্লাস শুরু হওয়ার আগের সময়ে কেউ খেলাধুলা, কেউ বিভিন্ন প্রোগ্রামিং কার্যক্রম, কেউ হ্যান্ড ক্রাফটে কাজ করে। ক্লাস শুরু হওয়ার ইঙ্গিতস্বরূপ এক ধরনের বিশেষ মিউজিক বেজে উঠলে সব ছাত্র-ছাত্রী দলবেঁধে ওয়াশরুমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করানো হয়। সেখানে তারা ফুটবল, দৌড়সহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে।

শিশুদের খেলায় অংশগ্রহণ (সূত্র: ইন্টারনেট)

গুরুত্বসহকারে সাঁতার শিখানো

সাঁতার জাপানিদের পাঠ্যক্রমের একটি অংশ। জাপানের বেশিরভাগ স্কুলে নিজস্ব সুইমিং পুল রয়েছে। সেখানে বাচ্চাদের ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রেখে কীভাবে সাঁতার কাটতে হয় তা শিখানো হয়। অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের গ্রীষ্মে প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

স্কুলে সাঁতার প্রশিক্ষণ (সূত্র: ইন্টারনেট)

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা

ওয়াশরুমে ছবির সাহায্যে হাত ধোয়ার গুরুত্ব ও পদ্ধতি বলে দেওয়া থাকে। প্রতিদিন দুপুরের খাবারের পর ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়ম মেনে দাঁত ব্রাশ করে। মাঝে মাঝে দাঁতের ডাক্তারগণ এসে শিশুদের দাঁত চেকআপ করেন। জাপানের স্কুলগুলোতে পরিচ্ছন্ন শৌচাগারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যকটি ফ্লোরে পরিচ্ছন্ন শৌচাগার রয়েছে। শৌচাগারগুলো ছেলে-মেয়েদের বয়স উপযোগী করে তৈরি। বাথরুমে যেতে সে সব জুতা পরিধান করতে হয় সেগুলো দরজার সামনে পরিপাটিভাবে সাজানো থাকে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স থাকেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত নার্স শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যাগুলো দেখেন।

দুর্যোগকালীন সচেতনা

আমরা জানি যে জাপানে প্রায়ই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। তাই ক্লাসগুলোতে গুরুত্বসহকারে দুর্যোগকালীন কী করণীয় এবং কী বর্জনীয় তা শেখানো হয়। ভূমিকম্পের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসের টেবিলের নিচে আশ্রয় নেওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় দুর্যোগকালীন উক্ত তালিকার কী কী সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটবে? সচেতনা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে দুর্যোগকালীন সময়ে নিরাপদ আশ্রয় যাওয়া সময় কী কী প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নিয়ে যাবে তার তালিকা দেখানোর মাধ্যমে শেখানো হয়।

পাঠ্যবই বহির্ভূত শিক্ষা

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৩য় শ্রেণি থেকে প্রোগ্রামিং শেখানো হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রেণিকক্ষে যে সব বিষয় শেখানো যায় না তার জন্য ফিল্ড ট্রিপের ব্যবস্থা করা হয়। ফিল্ড ট্রিপে কীভাবে ধান লাগানো হয়, কিভাবে পরিচর্যা করতে হয় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজগুলো করা হয় সেগুলো শেখানো হয়। প্রতিদিন ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের ক্লাবে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। সেখানে তারা বিভিন্ন চিত্র অংকন, বিভিন্ন কোম্পানির লোগো সংগ্রহ করা, জন্মদিন পালন ইত্যাদি কাজ করে। সর্বোচ্চ সংখ্যক লোগো সংগ্রহকারীকে পুরস্কৃত করা হয়।

জাপানের স্কুলগুলোতে শিশুদের কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ করতে হয়। যেমন সকালের সমাবেশের সময় শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করা, শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা নেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষককে সহযোগিতা করা, বাগানের পরিচর্যা করা, খাবার পরিবেশন করা এবং খাবারের পর ব্যবহৃত তৈজসপত্র, টেবিল ইত্যাদি পরিষ্কার করাসহ আরও অন্যান্য কাজকর্ম করে থাকে।

শারীরিক ব্যায়াম এর অংশবিশেষ (সূত্রঃ ইন্টারনেট)

সূত্রঃ

1. ইসলাম (২০২০), জাপানের স্কুলগুলোতে যেভাবে শিশুদের শিক্ষা দেয়া হয়. Retrieved from: https://www.jugantor.com/international/264852/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%
2. Lifebuzz. 15 Japanese School Rules That Would Never Fly In America. Retrieved from: https://lifebuzz.com/japanese-school
3. MENEZES (2019). Should children clean their own schools? Japan thinks so. Retrieved from: https://megaphone.upworthy.com/p/japan-children-clean-schools
4. Nippon (2020). Survey Finds Decline in Physical Fitness Among Japanese Children. Retrieved from: https://www.nippon.com/en/japan-data/h00632/survey-finds-decline-in-physical- fitness-among-japanese-children.html

জাদুকর

মোস্তফা জামান কায়সার
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ

অশান্ত প্রকৃতি, অস্থির সময়, সন্ধির মায়াজালে প্রাণ আজ শঙ্কাময়
খাঁ খাঁ রোদ্দুর, চৌচির মাঠঘাট, সূর্যটা জ্বলে উঠে, পাখিরা পায় ভয়
অদ্ভুত লোকগুলো, অলস সময় পার, ব্যস্ততার লেশ নেই, আছে শুধু কোলাহল
জানালার পাশে বসে, আনমনে চেয়ে থাকে, ছোট ছোট শিশু আর কিশোরীর দল।

নীল আকাশে মেঘদল ভেসে বেড়ায়, কাশফুল দোলে বাতাসে
যান্ত্রিক জীবনের একঘেয়েমি আছে, নেই শুধু শান্তি চারপাশে।
ছুটে চলা নদীধারা, মনে হয় অপসরা, ছুঁয়ে যায় ক্লান্ত মাটি
পাখিদের সেই গান, হারিয়েছে আজ প্রাণ, তারা আজ ছেড়েছে খাঁটি।

কী করি, কী করি, ভেবে ভেবে মরি, হয়েছে দশা আজ ফুলেদের
রঙিন ফুলগুলো হারিয়েছে ঔজ্জ্বল্য, যেন মৃত কাশফুল শরতের।
যাদুকর হেঁটে যায়, হাতটা বুলিয়ে যায়
অশান্ত প্রকৃতি প্রাণ ফিরে পায়,
ফুলগুলো জেগে যায়, রোদ্দুর মৃতপ্রায়
মৃত প্রাণ ফিরে পেয়ে পাখিরাও গান গায়।

জাদুকর বসে পড়ে, বৃক্ষের ছায়াতলে
নির্জন একাকী নিস্তব্ধতায়
ক্লান্ত নির্জীব মাটি প্রাণ ফিরে পায়
যান্ত্রিকতা যেন রূপ নেয় নীলিমায়।

লোকজন চেয়ে থাকে, অবাক হয়ে দেখে তাকে
কে এই আগন্তুক? নাকি কোনো অবতার?
জাদুকর হেসে বলে, পেয়ো নাকো কোনো ভয়
আমি নই জাদুকর, শুধুই এক গীতিকার!

এই বলে হাসিমুখে জাদুকর চলে যায়
হঠাৎই প্রকৃতি আবারও মৃত হয়ে যায়,
ফুলেরাও মরে যায়, পাখিদের গান থেমে যায়।

শিশুদের স্থূলতা: অপুষ্টির এক মারাত্মক পরিণাম

মোছাঃ দিলশাদ শারমিন চৌধুরী
শিক্ষার্থী
কাউন্সিলিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেন্টার (সিপিসি)

শিশুদের স্থূলতা বর্তমান সময়ের উপেক্ষিত একটি বিষয়, যা প্রকৃতপক্ষে অপুষ্টিরই একটি ধরন। এই স্থূলকায় শিশুরা পরবর্তীতে স্থূলকায় পূর্ণবয়স্ক হিসেবে বেড়ে ওঠে, যা তাদেরকে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। অপুষ্টির প্রকৃত অর্থ ত্রুটিপূর্ণ পুষ্টি। এটি একটি বিস্তৃত শব্দ যা অপুষ্টি এবং অতিপুষ্টি (স্থূলতা) উভয়কেই নির্দেশ করে। শিশুদের ওজন যখন তার উচ্চতার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়, তখনই দেখা দেয় এই অতিপুষ্টি। শিশুদের এই অতিপুষ্টি বা অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতা পরিমাপের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিএমআই (BMI=Body Mass Index) পদ্ধিতিটি ব্যবহার করা হয়।

বংশানুক্রমিক ধারা: মা-বাবা অথবা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের মধ্যে স্থূলতার প্রবলতা থাকলে শিশুরাও একই সমস্যায় ভোগে। এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনাচরণ বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাস ও শারীরিক চলনের পরিমাণও ওজন বাড়ার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুদের ওজন বাড়ার কারণগুলো আমাদের অনেকের জানা থাকলেও এর সাথে সম্পর্কিত পুষ্টি বিষয়ক তথ্য নিয়ে আমরা অনেকেই দ্বিধান্বিত। শিশুদের অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধিতে মূলত ক্যালরিবহুল খাবার গ্রহণকে দায়ী করা হলেও প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত ক্যালরি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের পাশাপাশি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস (ভিটামিন-মিনারেল) ঘাটতি শিশুদের স্থূলতা সমস্যার অন্যতম নিয়ামক। গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রক্রিয়াজাত নানাধরনের আকর্ষণীয় এবং সস্তা খাবার একদিকে যেমন অতিরিক্ত ক্যালরিবহুল অন্যদিকে তেমনি ভিটামিন-মিনারেলের ঘাটতিতে ভরপুর [১]। শিশুরা স্বভাবতই চিপস, চকলেট, কোমল পানীয় ও ফাস্ট ফুডের প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং বর্তমান সময়ে আমরা মা-বাবারাও বাচ্চাদের এসব কিনে দিতে দ্বিধা করি না। ফলে শরীরের বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ভিটামিন-মিনারেলের অভাবে দেখা দেয় স্থূলতা। অন্য আরেক গবেষণায় দেখা যায়, শরীরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস (ভিটামিন-মিনারেল) এর ঘাটতি সিরাম লেপটিনের ঘনত্বকে পরিবর্তন করে শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমতে সাহায্য করে [২]। লেপটিন এমন এক ধরনের হরমোন যা শরীরে শক্তি খরচের মাত্রা এবং ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে অতিরিক্ত চর্বি শরীরে সঞ্চয় হতে বাধা প্রদান করে। যখন শরীর তার প্রয়োজন অনুযায়ী ভিটামিন মিনারেল উপাদানগুলো সঠিকভাবে পায় না, তখন ক্ষুদার মাত্রাও বেড়ে যায় এবং সেই মুহূর্তে ক্যালরিবহুল খাবার গ্রহনের চাহিদা এবং গ্রহণের ফলে দেখা দেয় স্থূলতা। ভিটামিন-মিনারেল বিভিন্নভাবে আমাদের শারীরিক গঠনে, রোগ প্রতিরোধে এবং সক্রিয় থাকতে সহায়তা করে। নিম্নে এরকম উল্লেখযোগ্য কিছু ভিটামিন -মিনারেল কার্যকারিতা, স্থূলতা প্রতিরোধে তাদের ভূমিকা এবং উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ভিটামিন - মিনারেল ঘাটতি এবং স্থূলতা (গবেষণাবদ্ধ তথ্য):

ভিটামিন 'এ': ভিটামিন 'এ' শিশুদের দাঁত, ত্বক, হাড় এবং চোখের গঠনে অপরিহার্য এক উপাদান। এটি পিগমেন্ট উৎপাদনের মাধ্যমে চোখের রেটিনার গঠনে সহায়তা করে। বিভিন্ন গবেষণার তথ্য মতে, শরীরে ভিটামিন 'এ' পক্ষান্তরে রক্তে ভিটামিন 'এ' এর অনু উপাদান রেটিনল এর ঘাটতি সেই সকল শিশুদের মাঝে প্রকট যারা স্থূলকায় সমস্যায় আক্রান্ত। রক্তে রেটিনল এর সঠিক মাত্রার ঘনত্ব ইনসুলিনের নিঃসরণকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে স্থূলতা প্রতিরোধ করে [৩][৪]।

যে কোনো ধরনের রঙিন শাকসবজি বিশেষত লাল, সবুজ, হলুদ, কমলা রং ধারনকারী শাক-সবজি এবং ফল-মূলে ভিটামিন 'এ' এর উৎকৃষ্ট উৎস। এছাড়াও ডিমের কুসুম, দুগ্ধজাত খাবার, যকৃৎ এগুলোতেও প্রচুর পরিমানে ভিটামিন 'এ' থাকে [৫]।

সূত্র: ইন্টারনেট

ভিটামিন 'ডি': ভিটামিন 'ডি' বা সানশাইন ভিটামিন ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণ করে হাড় ও দাঁতের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণার তথ্য মতে, ভিটামিন 'ডি' এর অভাব শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমতে সাহায্য করে [৬,৭]। ফলে শরীরে আলস্য ভাব, ঘুম ঘুম ভাব এবং যে কোন কাজের প্রতি অনীহা বৃদ্ধি পায়, যার দীর্ঘায়িত ফলাফল হলো স্থূলতা ।

'বি' ভিটামিনসমূহ: বিভিন্ন গবেষনালব্ধ ফলাফল থেকে জানা যায় যে, করোনারী ধমনীর রোগে আক্রান্ত স্থূলকায় ব্যক্তির দেহে ভিটামিন বি-৬, বি-১২ এবং ফলিক এসিডের ঘাটতি রয়েছে। যদিও 'বি' ভিটামিনসমূহের ঘাটতির সাথে স্থূলতা সমস্যার সম্পর্ক এখনও পরিষ্কার নয় [৮]। মাংস (বিশেষ করে যকৃৎ), সামুদ্রিক মাছ, ডিম, দুগ্ধজাত খাবার, শস্য, বীজ প্রভৃতি ভিটামিন 'বি' এর ভাল উৎস।

সূত্র: ইন্টারনেট

জিংক: জিংক একটি অতীব জরুরি মিনারেল, যা গর্ভাবস্থা ও শৈশবকালীন বৃদ্ধি ও বিকাশ, উপযুক্ত স্বাদ ও গবেষণার অনুভূতি, ক্ষতের নিরাময় এবং রোগ প্রতিরোধের মত একাধিক শারীরিক কার্যকলাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষকদের মতে, জিংকের ঘাটতি ও স্থূলতা সরাসরি সম্পর্কিত। একাধিক গবেষণায় দেখা যায় যে, জিংক সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের স্বল্পতা বা রক্তে জিংকের স্বল্প ঘনত্ব সেন্ট্রাল এডিপোসিটি কে ত্বরান্বিত করে [৯]। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে তলপেটে চর্বি/মেদ জমা হতে থাকে, যা পরিণাম স্থূলতা।

আয়রন: শারীরিকভাবে সুস্থ্য থাকার পরও অনেক শিশুই একটু খেলাধুলা করলেই হাঁপিয়ে যায়। এটা মূলত আয়রনের অভাবের একটি চিত্র। শরীরে পর্যাপ্ত আয়রনের অভাব স্বাস্থ্যকর অক্সিজেন বহনকারী লোহিত রক্তকণিকা তৈরির প্রধান অন্তরায়, যা রক্তস্বল্পতা নামে পরিচিত। আয়রনের অভাবজনিত স্থূলতা ১৯৬০ এর দিকে স্থূল কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে পরিচালিত একটি গবেষণায় প্রথম গবেষকদের নজরে আসে [১০]। পরবর্তীতে আরো অনেক গবেষণায় শিশুদের মাঝেও আয়রনের অভাব এবং সেই সাথে স্থূলতার সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, যে সকল শিশুরা অতিরিক্ত ওজনধারী/স্থূল তাদের স্বাভাবিক ওজনধারী শিশুদের তুলনায় আয়রনের অভাবে ভোগার প্রবণতা প্রায় দ্বিগুণ [১১]। মাংস, যকৃৎ, ডিমের কুসুম, ঝাল জাতীয় খাবার এবং পালংশাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ভিটামিন-মিনারেলের অভাব মূলত অতিরিক্ত মাতৃমৃত্যু ঝুঁকি, শিশুদের সংক্রমক রোগগুলোতে আক্রান্ত হওয়ার উচ্চ প্রবণতা, সেই সাথে বিলম্বিত বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্যার সাথে সম্পর্কিত হলেও ভিটামিন-মিনারেলেও অভাব যে স্থূলতা সমস্যার ও একটি বড় নিয়ামক তা সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ ফলাফল অনেকটাই পরিষ্কার করে দিয়েছে।

অতিরিক্ত ওজন/স্থূলতা সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের পূর্ণবয়সে হৃদয়রোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং হরমোনজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকি থাকে। শিশুদের এই সমস্যা সমাধানে এবং তাদের জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে মা-বাবাকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকিতে থাকা শহুরে শিশুর অভিভাবকদের মুঠোফোন আর কম্পিউটারের বন্দি এই শিশুদের খেলাধুলা ও শারীরিক পরিশ্রম হয় এমন কাজগুলোতে সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি অবশ্যই রেস্টুরেন্টের খাবারের পরিবর্তে বাড়িতে তৈরি ভিটামিন মিনারেলসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে উৎসাহী করতে হবে। তবেই শিশুরা স্থূলতা নামক এই ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত হতে পারবে।

সূত্রঃ

1. Bird, J., et al. (2017, June 24). Risk of Deficiency in Multiple Concurrent Micronutrients in Children and Adults in the United States. Retrieved September 09, 2020

2. García, O. P., et al. (2009). Impact of micronutrient deficiencies on obesity. Nutrition Reviews, 67(10), 559-572. doi:10.1111/j.1753-4887.2009. 00228.x

3. Strauss RS. Comparison of serum concentrations of alphatocopherol and beta-carotene in a cross-sectional sample of obese and nonobese children (NHANES III). National Health and Nutrition Examination Survey. J Pediatr. 1999;134:160–165.

4. Villaca Chaves G, Pereira SE, Saboya CJ, Ramalho A. Nonalcoholic fatty liver disease and its relationship with the nutritional status of vitamin A in individuals with class III obesity. Obes Surg. 2008;18:378–385.

5. Viroonudomphol, et al (2003). The relationships between anthropometric measurements,

6. Botella-Carretero et al (2007). Vitamin D deficiency is associated with the metabolic syndrome in morbid obesity. Clin Nutr. 2007;26:573–580.

7. Carlin AM, Rao DS, Meslemani AM, et al. Prevalence of vitamin D depletion among morbidly obese patients seeking gastric bypass surgery. Surg Obes Relat Dis. 2006; 2:98–103. discussion 104.

8. Tungtrongchitr, et al (2003). Serum homocysteine, B12 and folic acid concentration in Thai overweight and obese subjects. Int J Vitam Nutr Res. 2003;73:8–14.

9. Weisstaub et al (2007). Plasma zinc concentration, body composition and physical activity in obese preschool children. Biol Trace Elem Res. 2007;118:167–174.

10. Wenzel et al (1962). Hypoferraemia in obese adolescents. Lancet. 1962;2:327–328.

11. Pinhas-Hamiel et al, (2003). Greater prevalence of iron deficiency in overweight and obese children and adolescents. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003;27:416–418.

অগ্নি স্নানে শুচি হোক ধরা

জাওহারা রহমান জর্জিয়া
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলোজি

পহেলা বৈশাখের কথা। বন্ধুদের নিয়ে পহেলা বৈশাখের একটা অনুষ্ঠানে বসে আছি। মঞ্চে নাচ, গান, আবৃত্তি হচ্ছে একের পর এক। চারপাশে রঙিন পোশাকের মানুষজনের আনন্দময় সমাবেশ। বন্ধুদের সাথে কথা বলার এক ফাঁকে খেয়াল হলো আমার বাঁ পাশে তিন চার বছর বয়সী একটা হতদরিদ্র মেয়ে বসে আছে। গায়ে ময়লা স্যান্ডো গেঞ্জি, আর হাফ প্যান্ট। ন্যাড়া মাথা। তবে চোখে পড়ার বিষয় হলো, মেয়েটির দু গালে লাল সবুজ রঙে লেখা, শুভ নববর্ষ।

মেয়েটিকে ঐ লেখাটা কে লিখে দিলো জানার খুব কৌতূহল হলো।
মেয়েটিকে বললাম,"তোমার গালে এটা কে লিখে দিয়েছে?"
মেয়েটি যে উত্তর দিলো তা ছিলো অপ্রত্যাশিত।
"আমার মা।"

ফুটপাতে কিংবা ওভারব্রীজে কিংবা রেল লাইনের পাশে থাকা ভাসমান মানুষেরা লিখতে পড়তে জানে না বলেই আমার ধারণা ছিলো। এখন দেখলাম ধারণাটি ঠিক নয়।

তারপর মেয়েটিকে বললাম, "তোমার মা কোথায়?"
মেয়েটি পেছনে ঘুরে হাত দিয়ে তার মাকে দেখালো।

মলিন মুখ, মলিন পোশাকের একজন মহিলা কিছুটা দূরে মঞ্চের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স ত্রিশের মতো। কোলে একটা বাচ্চা। মহিলাটির অভাব পীড়িত মুখটি দেখে বোঝা যাচ্ছিলো জীবন কতো দয়াহীন হয় কারো কারো জন্য! তবে এই ভেবে ভালো লাগলো যে, মেয়েকে ঝলমলে রঙিন পোশাক কিনে দেয়ার সাধ্য তার নেই, তাই বলে কি মেয়েটা নববর্ষের খুশিতে যোগ দেবে না? মা'টি তাই তীব্র দারিদ্রতা সত্ত্বেও মেয়েকে আজকের এই আনন্দময় দিনে একটুখানি আনন্দ দেয়ার জন্য, মেয়েটির মুখে এঁকে দিলো, শুভ নববর্ষ। তারপর মেয়েকে নিয়ে এলো বৈশাখী অনুষ্ঠানে।

মা এবং মেয়েটির মতো হতদরিদ্র আরো কেউ কেউ সেখানে ছিলো। তবে তাদের সাথে এই পরিবারটির পার্থক্য হলো, অন্যেরা যেখানে ভিক্ষা করতে ব্যস্ত, সেখানে এই পরিবারটি ভিক্ষা না করে চেয়ে আছে মঞ্চের দিকে। অর্থাৎ তারা এখানে ভিক্ষা করতে আসেনি। এসেছে নববর্ষের আনন্দে সামিল হতে। এটাও আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিলো।

একটু পর মেয়েটি আমাকে যে অভিজ্ঞতা দিলো তা মনে দাগ না কেটে উপায় রইলো না।

আমাদের নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলো একজন ফেরিওয়ালা। সে ছোটোদের খেলনা বিক্রি করছে। বাঁশি, চরকি, মুখোশ, বেলুন এসব। এমন ফেরিওয়ালা সেখানে আরো ছিলো। ঐ বৈশাখী অনুষ্ঠানে আসা প্রায় প্রত্যেকটি ছোটো ছেলে মেয়েদের কাছে কিছু না কিছু খেলনা ছিলো। হয় বাঁশি, নয় চরকি, নয় মুখোশ, নয় বেলুন, কেউ বা ফুঁ দিয়ে বানাচ্ছে বাবলা। ছোট্ট মেয়েটির সামনে যে পরিবারটি ছিলো, তাদের ছোট্ট ছেলেটি ফেরিওয়ালাকে দেখিয়ে মাকে বললো,"আমাকে একটা বেলুন কিনে দাও।" মা বেলুন কিনে দিলো ছেলেটিকে। বেলুন পেয়ে ছেলেটি মনের আনন্দে খেলতে লাগলো। ছোট্ট মেয়েটি পুরো ঘটনাটি দেখলো। ঐ ছেলেটি আর এই

মেয়েটি একই বয়সী। ঐ ছেলেটির যেমন বেলুনের প্রতি আগ্রহ রয়েছে, এই মেয়েটিরও নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু ঐ ছেলেটির মতো এই মেয়েটি তার মাকে বলে নি বেলুন কিনে দিতে। কারণ ঐটুকু বয়সেই সে জেনে গেছে, বেলুন কিংবা অন্য কোনো খেলনা কিনে দেয়ার ক্ষমতা তার মায়ের নেই। কিংবা থাকলেও ওগুলো কেনা তাদের জন্য অনুচিত। হয়তো পূর্বে একাধিকবার চেয়ে না পেয়ে এ শিক্ষা সে পেয়েছে। ছোট্ট মেয়েটির এই বুঝ আমাকে গোপনে কাঁপিয়ে দিলো। মেয়েটি মাকে কিছু না বলে শুধু চুপটি করে বিষণ্ন চোখে চেয়ে রইলো বেলুন নিয়ে খেলতে থাকা ছেলেটির দিকে আর ফেরিওয়ালার খেলনাগুলোর দিকে।

আমি খানিকক্ষণ মেয়েটির বিষণ্ন চোখ দুটো দেখলাম। তারপর বন্ধুদের বসতে বলে শব্দহীন উঠে দাঁড়িয়ে অন্য একটা ফেরিওয়ালার কাছে গেলাম এবং কিনলাম বেলুন, চরকি, মুখোশ, বাঁশি। কিনে এনে চুপিচুপি মেয়েটির পাশে এসে বসলাম। মেয়েটি তখনো বিষণ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ফেরিওয়ালার রঙ বেরঙের খেলনাগুলোর দিকে আর কখনো বেলুন নিয়ে খেলতে থাকা ছেলেটির দিকে।

বন্ধুরা আমার দিকে তাকালে তাদের ইঙ্গিতে বললাম কিছু না বলার জন্য। খেলনাগুলোকে আমার অন্য পাশে লুকিয়ে রেখে মেয়েটিকে বললাম, "তোমার বেলুন ভালো লাগে?"

মেয়েটি মাথা নেড়ে বললো লাগে।

"তোমার চরকি ভালো লাগে?"

মাথা নেড়ে বললো লাগে।

"তোমার বাঁশি ভালো লাগে?"

মাথা নেড়ে বললো লাগে।

"তোমার মুখোশ ভালো লাগে?"

মাথা নেড়ে বললো লাগে।

এরপর আড়াল থেকে খেলনাগুলো বের করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম,"এগুলো তোমার জন্য।"

মেয়েটি খেলনাগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। মনে হচ্ছে এমন অবাক সে কখনো হয় নি। সে হাত গুটিয়ে বসে আছে। বুঝতে পারছে না কী করবে? আমি হাসি মুখে বললাম,"নাও। এগুলো তোমার জন্য।" কিছু সময় দ্বিধা করার পর সে আস্তে হাত বাড়িয়ে খেলনাগুলো নিলো।

একটু পর মেয়েটি দু'হাতে খেলনাগুলো বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে কিছুটা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মায়ের কাছে ফিরে গেলো। মেয়েটি তার মাকে কী বললো জানি না। শুধু দেখলাম মা'টি আমার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য সুন্দর কৃতজ্ঞতার হাসি হাসলো। জবাবে মৃদু হেসে তাদের বললাম, "শুভ নববর্ষ।"

মাথার ওপর ছিলো বিশাল শিরিষ গাছ। বৈশাখী চঞ্চল হাওয়ায় ওপর থেকে ঝরে ঝরে পড়ছিলো শিরিষ ফুল আর পাতা। দৃশ্যটির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

নিঃস্বার্থ ভালোবাসা

মোঃ তৌফিকুল ইসলাম
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলোজি

আমি তখন ক্লাস সিক্সের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি, রেজাল্ট তখনো প্রকাশিত হয়নি, আব্বার আগে থেকেই ইচ্ছা ছিলো আমাকে ক্যাডেট কলেজে পড়ানোর। একটা কোচিংয়ে আমি ভর্তি হয়েছিলাম, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের ভর্তি ফরমও কিনেছিলাম আমি।

আব্বার সাথে পরীক্ষার আগেরদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে বাসে করে কুমিল্লা গিয়েছিলাম। আমার এখনো মনে আছে মেডকটা হোটেলে রাতে থেকেছিলাম আমরা। কারো বাসায় থাকলে আমার পড়ার অসুবিধা হবে বলে আব্বা হোটেলে উঠেন। খুব ভোরে আমরা ট্যাক্সি করে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজে গিয়েছিলাম। কুমিল্লায় ছিলো তখন খুবই ঠান্ডা। আমার পরনে ছিলো তখন একটা ফুলহাতা গেঞ্জি। আমার মনে পড়ে আব্বা একহাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে রেখেছিলেন যাতে করে আমার ঠান্ডা না লাগে।

ক্যাডেট কলেজে গিয়ে আমার স্কুলের অনেকের সাথেই দেখা হয়। লাইনে দাঁড়িয়েই অপরিচিত কয়েকজন ছেলের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

দুপুরে আমরা একটা ক্যান্টিনে খেতে যাই। আমি আর আমার একবন্ধু একসাথে খেতে বসি। কিন্তু আব্বাকে শত বলার পরও খেতে বসেন নি। রাতের ট্রেনেই আমরা কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আসি। আব্বা দুটা টিকেট আগেই কেটে রাখেন কিন্তু আমার সেই বন্ধুর বাবা কোনো টিকেট কাটেন নি। আব্বাকে পরে আমি বলি কেউ তো টিকেট চেক করতে আসেনি। আপনি কেন অযথাই টিকেট কাটতে গেলেন...?? আমার উত্তরে আব্বা বলেছিলেন আমার ছেলের সামনে যদি কেউ আমাকে টিকেটের জন্য কিছু বলে এরচেয়ে লজ্জার কিছু আমার জন্য হবে না। পরে আম্মার কাছে জানতে পারি সেদিন দুপুরে আব্বা খান নি কারণ আব্বা ভয়ে ছিলেন রাস্তায় যদি টাকার শর্ট পড়ে।

২০১০ সালের ঘটনা। আব্বা খুবই অসুস্থ। ডায়াবেটিক, লিভারের সমস্যাসহ আরো অনেক জটিল রোগে আব্বা ভুগছেন। একসময় আব্বার বমির সাথে রক্ত বের হতে লাগলো। জরুরি আব্বাকে এম্বুলেন্সে ঢাকা আনা হলো। আমি এম্বুলেন্সে আসতে পারবো না বলে তখন আসিনি। ঢাকায় যখন আব্বাকে আনা হলো তখন আব্বার মুমূর্ষু অবস্থা। ডাক্তার বললেন রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। পারলে বাসায় নিয়ে যান। আব্বা তখন ইশারায় আম্মাকে বলছেন বাড়ি না যেতে। আর বলছেন আমি যাতে ভালোভাবে পড়াশুনা করি।

কাকতালীয়ভাবে আব্বা সে যাত্রায় বেঁচে যান। ডাক্তার মুবিন খান তখন আব্বাকে বলেছিলেন, আল্লাহর অশেষ রহমানীতে এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন।

তার দুদিন পর আমি গ্রীনরোডের গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতালে আব্বাকে দেখতে যাই। আব্বা তখন মোটামুটি সুস্থ, কথাও বলতে পারেন। কখনো হাসপাতালে রাতে থাকি নাই আগে তাই বসে বসে আমি একটা পেপার পড়ছিলাম কিন্তু বার বার আব্বা পেপারটা রেখে দিতে বলছিলেন। একসময় আমি বিরক্ত হয়েই বলি পেপার পড়লে আপনার কি সমস্যা আব্বা...আব্বা তখন বলেছিলেন তুই

পেপার পড়লে আমি তোর মুখটা দেখতে পাই না বাবা...!!!

আমি নির্বিকার ছিলাম তখন, এ কথার উত্তরে কি বলতে হয় তা আমার জানা ছিলো না।

খুবই ছোটবেলায় একবার আব্বার সাথে ট্রেনে ঢাকায় কাকার বাসায় এসেছিলাম। যাবার সময় ট্রেনে আমি ওয়াশরুমে গিয়েছিলাম। আমি বড় হবার পর আব্বা বলতেন এখন তো বড় হয়ে গেছো চলন্ত ট্রেনে ডানহাত দিয়ে তোমাকে পরিষ্কার করেছিলাম তা হয়তো ভুলে গেছো... বালিশে খুব কমই ঘুমাতাম আমি। আব্বার বামহাতে ঘুমাতাম বলে উনার বামহাতটা প্রায় অবশ হয়ে যেত।

আব্বা মারা যাওয়ার আগের দিনগুলোর কথা মাঝরাতে কেন জানি খুব মনে পড়ে। আব্বা কিভাবে অসহ্য ব্যথায় কেঁদে উঠতেন, আব্বার মুখটা কেমন শিশুর মতো হয়ে গিয়েছিলো।

আব্বার ভালোবাসার ঋণ শোধ করার সুযোগ না দিয়েই আব্বা চলে গেলেন। বড় অসময়ে, কোনকিছু বুঝে উঠার আগেই।

পরপারে ভালো থেকো আব্বা।

বাংলাদেশের উপজাতির বর্ষবরণ উৎসব

আল জামাল মোস্তফা সিদ্দাইনী (তমাল)
সহকারী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলোজি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ছোট রাষ্ট্র। এ ভূখণ্ডের জনসংখ্যার অধিকাংশের নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী বাঙালি এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ দেশে অনেক উপজাতি রয়েছে এবং তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় বিভিন্ন শ্রেণির উপজাতিদের বসবাস রয়েছে। বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের বেশিরভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহ, সিলেট ও রাজশাহী অঞ্চলে বসবাস করে। এদের অনেক শ্রেণির উপজাতি বর্ষবরণের উৎসব, আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এর মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক উপজাতির বর্ষবরণের কথা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

চাকমাদের বর্ষবরণ:

বাংলাদেশের প্রধান উপজাতি চাকমা। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির মানুষ। পার্বত্য জেলাগুলোতে এদের বসবাস বেশি লক্ষ করা যায়। মানুষে এদেরকে চাকমা বললেও তারা নিজেদের 'চাঙমা' বলে দাবি করে। বাংলাদেশ ছাড়া চাকমাদের বাস রয়েছে ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরাইল ও অরুণাচলে। বার্মার আরাকান অঞ্চলের আকিয়াব জেলায় চাকমাদের বাস রয়েছে। তাদের সে দেশের লোকেরা 'দৈংনাক' বলে থাকে। চাকমাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম বিঝু। সুগত চাকমা বলেছেন, "বাংলা নববর্ষের শেষ দুইদিন ও নববর্ষের প্রথম দিনে চাকমারা বিঝু উৎসব পালন করে। পুরানো বর্ষের শেষ দিন বিঝু, আর আগের দিন ফুল বিঝু এবং নববর্ষের প্রথম দিনটিকে 'গোর্জ্যাপোর্জ্যা' দিন বলা হয়। উপরোক্ত তিনটি দিনের মধ্যে মূল বিঝু দিনটিই প্রকৃত বিঝু দিন। ঐ দিন ঘরে ঘরে প্রচুর খানা-পিনার ব্যবস্থা করা হয় এবং অতিথিদের জন্য সবার দ্বার উন্মুক্ত থাকে। শিশুরা ঘরে ঘরে আদর পায় এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। কিশোরীরা খুব ভোরে নদী থেকে জল তুলে নানা-নানীদের স্নান করিয়ে ওইদিন পূণ্য অর্জন করে। নববর্ষ বা 'গোর্জা পোর্জ্যা' দিনে অনেকে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধের পুজা করে ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে ধর্মের দেশনা শ্রবণ করে।"

তঞ্চঙ্গাদের বর্ষবরণ:

চাকমাদের অন্যতম শাখার নাম তঞ্চঙ্গা। কক্সবাজার জেলার নাফ নদীর তীরে ও বান্দরবান জেলার বিভিন্ন স্থানে এদের বসবাস বেশি দেখা যায়। চাকমাদের মতই তঞ্চঙ্গারা নববর্ষ পালন করে থাকে। মেসবাহ কামাল বলেছেন, "গোর্জ্যাপোর্জ্যা, দিনে অনাগত ভবিষ্যৎ দিনগুলোর মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। চাকমা ও তঞ্চঙ্গা জাতির মানুষেরা এই দিন নাচ-গান ও পরস্পরের বাড়িতে বেড়ানোর মধ্যে দিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করেন।"

ত্রিপুরাদের বর্ষবরণ:

তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি হলো ত্রিপুরা। কেউ কেউ এদেরকে টিপরা বা তিপারা বলে থাকে। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লার পাহাড়ি অঞ্চলে এদের বসবাস। এদের আদি নিবাস হলো ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে। এরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ। এদের নববর্ষ উৎসব শুরু হয় নববর্ষ শুরু হবার দু'দিন আগে। এদের নববর্ষের অনুষ্ঠানের নাম 'বৈসু'। প্রথমদিন তারা বাড়িঘর পরিষ্কার ও সাজিয়ে-গুছিয়ে নেয়। নানা ফুল দিয়ে সজ্জিত করে। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে ফুলের পাপড়ি ছিড়ে পানিতে ভাসিয়ে দেয়ার উৎসবে মেতে ওঠে। প্রতিটি ত্রিপুরাদের ঘরে নানা রকমের খাবার তৈরি করা হয়। তবে খাবারের তালিকা মাছ ও মাংস থাকে না। এদিনে ১শ' ৮ প্রকার সব্জি দিয়ে রান্না করা হয়। এটাকে বলে পাঁচন। কার ঘরে কেমন ভালো

পাঁচন রান্না হয়েছে তা' নিয়েও অনেক সময় প্রতিযোগিতা চলে। বাড়িতে প্রতিবেশী এলে এদিনে তাদেরকে পাঁচন দিয়ে খাবার পরিবেশন করা হয়।

নববর্ষের দিনে ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী নাচ-গান ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। পাড়ায় পাড়ায় চলে 'গয়ারা' নৃত্য। এতে আছে ২২টি মুদ্রার দলীয় নৃত্য। যারা নৃত্য পরিবেশন করে তাদের বাড়ির মালিক মদ, মুরগির বাচ্চা, চাল দিয়ে থাকে। তাদের করা হয় আশীর্বাদ।

পাহাড়ি জঙ্গলে পাওয়া যায় 'শিওই'। এটা লম্বা শিমের বীচের মতো। নববর্ষের দিনে শিওই দিয়ে যুবক-যুবতীরা খেলা করে থাকে। ঘরে তৈরি মদ প্রায় সবাই এদিনে পান করে থাকে। মদ খেয়ে তারা গানে মেতে ওঠে। যেমন ত্রিপুরাদের একটি নববর্ষের গান হলো:

"তুরুরু তুরুরু
সুমুর সুরতিথই
পাড়া পাড়া বেড়াইয়ে
বাকসা মিনিয়ট তিনি বৈস্যু বৈস্যু বৈস্যু
ফাইখা বৈস্যু বৈস্যু বৈস্যু।"

মারমাদের বর্ষবরণ:
উপজাতিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মারমা। এদের আদি নিবাস বার্মা ও আরাকানে। এরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ। এদের অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্ম পালন করে থাকে। নববর্ষের দিনে মারমারা আয়োজন করে পানি খেলা। এটা তাদের ঐতিহ্যবাহী খেলা। তাছাড়া নববর্ষ দিনে তারা পরস্পরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে।

খ্রোদের বর্ষবরণ:
বান্দরবান জেলায় খ্রোদের বসবাস বেশি দেখা যায়। খ্রোরা নববর্ষ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে থাকে। তাদের নববর্ষের একটি অনুষ্ঠানের নাম 'রুংকাই'। চৈত্র সংক্রান্তিতে খ্রোরা বিশেষ করে নারীরা নানা সাজে সাজিয়ে নেয়। নববর্ষের দিনে যুবক-যুবতীরা দাঁতে রং লাগায়, যুবতীরা খোঁপায় ফুল গুজে নেয়। অপরদিকে বাঁশি ও ঢোল বাজিয়ে নববর্ষ পালনের আয়োজনও কেউ কেউ করে থাকে। নববর্ষের দিনে খ্রোর মহিলার হাঙ্গর মাছের শুটকি দিয়ে পাঁচন তৈরি করে থাকে। এ পাঁচন দিয়ে পাড়া প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনদের আপ্যায়ন করা হয়। নববর্ষের অনুষ্ঠান চলে সারাদিন ও রাত ধরে।

সাঁওতালদের বর্ষবরণ:
বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় সাঁওতালদের বসবাস রয়েছে। সাঁওতালরা নববর্ষ পালন করে থাকে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তাদের নববর্ষের প্রধান অনুষ্ঠানের নাম 'স্যালসেই'। বসন্তকাল শুরু হবার সাথে সাথে স্যালসেই অনুষ্ঠান শুরু হয় আর তা শেষ হয় নববর্ষের প্রথমদিনে। শেষদিনে উৎসবে রূপ লাভ করে। এদিনে সাঁওতালরা তাদের গাছপালা যত্ন নেয়। গৃহপালিত পশুকে গোসল করায়। আর নাচ-গান ও ভালো খাবারের আয়োজন করা হয়। সাঁওতালরা' মনে করেন যে, নববর্ষের দিনে যদি ভালো শিকার মেলে তাহলে সারা বছরই ভালো কাটবে।

মনিপুরীদের বর্ষবরণ:
বাংলাদেশে পাহাড়ী অঞ্চলে মনিপুরীদের বসবাস রয়েছে। এরা নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নববর্ষ পালন করে থাকে। বেশিরভাগ মনিপুরীরা গ্রামে বাস করে। বর্তমানে শহরেও এদের বাস করতে দেখা যায়। নববর্ষের উৎসবকে সামনে রেখে মনিপুরীরা তাদের কর্মস্থল থেকে নিজ গৃহে ফিরে যায়। এদের নববর্ষের অনুষ্ঠানের নাম 'শ্যাজিব্যু তেইবাউবা'। এ অনুষ্ঠান চলে পাঁচদিন ধরে। অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে নানা ধরনের খেলাধুলা ও আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে মনিপুরী মহিলারা ১০৮ রকমের সব্জি রান্না করে। অন্যকেউ খাবার আগে কিছু খাবার কলা পাতায় করে তিনমুখো রাস্তার ওপর রেখে আসে। এ খাবার পশু বা পক্ষী খেলে নানাভাবে তার অর্থ হয়। এর ওপরই নাকি নির্ভর করে নতুন বছরের ভালো-মন্দ। পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে তরকারি আদান-প্রদান হয়। বাড়িতে অতিথি এলে মিষ্টি খেতে দেওয়া হয়। নববর্ষের অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনেক নারী-পুরুষ

নতুন পোশাক পরে থাকে। পাঁচদিন ধরে চলে এ অনুষ্ঠান। প্রতিদিন আয়োজন করা হয় নৃত্য ও গীতের। যুবক-যুবতীরা হাত ধরে নাচে। সারারাত ছেলে-মেয়েরা এক সাথে নাচে-গানে ভরে তোলে।

গারোদের বর্ষবরণঃ

বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ গারোদের বসবাস বেশি লক্ষ করা যায়। টাঙ্গাইল ও সিলেটেও এদের বসবাস আছে। গারোরা পহেলা বৈশাখে নানা রকমের পিঠা বানায়। গৃহপালিত পশু-পক্ষীকে ভালো খাবার দেওয়া হয়। পহেলা বৈশাখের আগে গারোরা কাঁচা আম খায়না। কোন স্থানে গারোরা মেলার আয়োজনও করে থাকে। বাংলাদেশের উপজাতিদের মধ্যে আরো যারা নববর্ষ পালন করতো তারা নানা কারণে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করা বাদ দিয়েছে। পরিশেষে মেসবাহ কামাল-এর কথায় বলতে চাই, "পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্যোম বা বৃহত্তর সিলেটের খাসিয়া জাতির মানুষেরা খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হবার পর ঐতিহ্যিক বর্ষবরণ বাদ দিয়ে খ্রিষ্টিয় বর্ষপঞ্জির প্রথম দিনটিতে নববর্ষ হিসেবে পালন করে থাকেন। যেমন করে বাঙালি ধনিক শ্রেণীর একাংশ ধর্মান্তরিত না হয়েও। তবে আদিবাসী নতুন প্রজন্ম শেকড়ের সন্ধান শুরু করেছে। ধর্ম বিশ্বাস যেন সাংস্কৃতিক উত্তারাধিকারকে ব্যাহত না করে সে ব্যাপারে তারা সচেতন হচ্ছে।"

আমার শহর ও আজকের নারী

আনিকা মেহের আমিন
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন মার্কেটিং

জীবনের পথচলায় আমরা সম্মুখীন হই নানান মানুষের নানান পরিস্থিতির সাথে। নিজেকে নিজের মতো গড়ে তুলি। নিজের পরিবেশ, সমাজ ও শিক্ষার গঠনের ছাঁচে বেড়ে উঠে আমাদের চরিত্র। কতবার থেমে ভেবেছি, আমার পাশের বাড়ির মেয়েটাও কি আমার মতো চিন্তাধারা লালন করে? জীবনের বয়ে চলাতে, তার কেমন বাধার মুখোমুখি হতে হচ্ছে? একই সমাজ, একই শহরে ন্যাথো ধরনের নারী বেড়ে উঠেছে, তারা তাদের মতো করে জীবনযুদ্ধে লড়াই করে চলেছে।

কেউ বোরখার পিছে লাল টুকটুকে লিপস্টিক দিয়েছে, কেউ বা সেই গাঢ় রংটি চড়িয়েছে সিঁথিতে। এক পেঁচে শাড়ি পরা নারীটি সকাল থেকে রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে, পাশে দিয়ে যাচ্ছে সেলোয়ার-কামিজ পড়া অফিস যাওয়া মেয়েটি। দুজনেই সকাল ৫টায় উঠেছে, দুজনেই জীবিকা অর্জন করতে নেমেছে রাস্তায়। স্কুল ইউনিফর্ম পড়া মেয়েটিকে সকালে মা বাসে তুলে দিতে যায়, ঘরে বসা ছোট কাজের মেয়েটি জানালা দিয়ে বসে তা দেখে, দুই বছরেও শেষ করতে না পারা আদর্শলিপির বইটি নিয়ে ঘরের কোণে বসে যায়। আমার শহরে রয়েছে নারী পুলিশ, জীবনের যুদ্ধে সে পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে, আমার শহরে রয়েছে গৃহকর্মী, নিজের পেটের দায়ভার নিজেই পোষণ করে চলেছে সে। আমি দেখেছি ৩০ বছর চাকরি করে সবচেয়ে উঁচু পদে প্রোমশন পাওয়া চাকরিজীবির উচ্ছ্বাস, আমি দেখেছি ৩০ বছর সংসারে সব সময় দিয়ে দেওয়া নারীর হঠাৎ ছেলেবেলার বান্ধবিদের খুজে পাওয়ার আনন্দ। আমার শহরে মিল-অমিলের সবাই একসাথে চলে, নিকাবি বান্ধবির সাথে পাঙ্ক সাজ দেওয়া মেয়েটিও বন্ধু, শাড়ির সাথে টাইট বেণি ও টিপ দেওয়া মেয়েটি জানে জিন্স-টপসও পড়তে। আমার শহরে দৌড়ে বাসে উঠেছি আমি, দূর দূর পর্যন্ত রিকশায় হেলে দুলে, কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে দিয়ে গান শুনতে শুনতে কর্মস্থলে পৌঁছেছি।

আমার শহরে রয়েছে রেড লাইট এরিয়া, সমাজ পতিতাদের মেনে না নিলেও, সেই তুচ্ছতা উপেক্ষা করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে তারা। তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানকে নিজের করে মেনে না নিলেও, এই তৃতীয় লিঙ্গের নারীই নিয়েছে তাদেরকে মাতৃত্বের ছায়ায়, লালন করে তুলেছে ভালো মানুষ হিসেবে। আমার শহরে রাস্তায় একা হাটলেও মুখোমুখি হতে হয় নানান হয়রানির, তার কারণে আমার শহরের মেয়েরা দমে যায়নি, লড়াই চালিয়ে গিয়েছে, অ্যাসিডে মুখ পুড়িয়ে দিলেও, পারেনি তাদের মনের এগিয়ে যাওয়ার অদম্য আগুনটিকে নিভাতে। আর্মির যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা প্লেন চালাতে, পিছিয়ে থাকেনি আমার শহরের মেয়েরা, ডাক্তার হয়ে চিকিৎসা দেওয়া, নার্স হয়ে মানুষের সেবা করে চলেছে আমার শহরের নারী। পলিটিক্সে নেতৃত্ব দিয়েছে আমার শহরের নারী, অর্জন করেছে দেশেরও নেতৃত্ব, হয়েছে বিজ্ঞানীক, নভোচারী, চড়েছে এভারেস্টের চূড়ায়। কেউ হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ব্যাবসায়ী, কেউ লেখিকা, কেউ হয়েছে সাংবাদিক, কেউ হয়েছে টিচার কিংবা লইয়ার। না শুধু পাঠ্যবই দ্বারা না, আমার শহরে নারী পারে আঁচল কোমরে গুঁজে মাথার উপর থাক থাক ইটা তুলতে, পারে খোঁপা বেধে ঘন্টার পর ঘন্টা পার্লারে অন্যের রূপচর্চা করে দিতে। দেখেছি বছরের পর বছর ট্রেনিং করে অ্যাথেলিট ও স্পোর্টসে নেতৃত্ব নিতে অদম্য এই নারীদের। আমি দেখেছি ঘরে বসে থাকা নতুন গ্র্যাজুয়েট মেয়েটাকে বিয়ের কথা উপেক্ষা করে চাকরি খুঁজতে লড়তে, আমি দেখেছি ডমেস্টিক অ্যাবিউজের শিকার মেয়েটাকে তার বিরুদ্ধে লড়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠতে। আমি দেখেছি নিজের সেলাই ও রান্না বেঁচে জীবিকা অর্জন করতে থাকা নারীটির ইচ্ছাশক্তি তার সেলাইয়ের ফোঁড়ে, মসলার ছকে। আমার শহরের মডেল ও ব্লগার নিজেদের স্ট্রাগেল নিয়ে সত্য

কথা বলে, আমার শহরের নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী কিংবা অভিনেত্রিরা অবাস্তব প্রত্যাশা দাঁড় করেনা আজকের মেয়েদের জন্য। আমার শহরে মেয়েরা সব উপেক্ষা করে। আমার এই পুরুষ-প্রাধান্য শহর নারীকে অনেক ভয় দেখিয়েছে, দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে; পারেনি। আমার শহরে নারী হয়রত খাদিজা (রা.) বিবির নীতি মেনে নিজের জীবিকা নিজে অর্জন করে, আমার শহরে নারী দুর্গার রূপ ধরে অন্যায়ের সাথে যুদ্ধ করে, মাদার মেরির মতো একা নিজের বিশ্বাস ও সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, ইয়েশোধারার মতো ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে সফলতা অর্জন করে নেয়। আমার এই শহরকে উজ্জ্বল করেছে নারী, মাতিয়েছে রঙে, গড়ে তুলেছে এই সুন্দর ভাস্কর্যে, যা আগামীর নারীকে প্রেরণা দেয় প্রতিদিন এগিয়ে যাবার।

সুখ

মাহমুদুর রহমান
শিক্ষার্থী
এমবিএ প্রফেশনাল

সুখী হতে চাই আমি
এই জগৎ সংসারে
সুখ যে মোরে চায় না হায়
দুঃখ চায় আমারে।

সুখ সুখ করি আমি
সুখ কে যে পাইনা
সুখ ছাড়া এ জগতে
বাঁচতে আমি চাইনা।

সুখ হলো আনন্দ আর
দুঃখ হলো বেদনা
বেদনার মধ্যে আছে
ছোট্ট একটি ছলনা।

সুখ কি জিনিস
দেখতে কেমন
বলতে পারে কেউ?
তবুও সুখের পিছে ছুটে
দুঃখী মানুষ সেও।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) কী ও কেন

তোফায়েল আহমেদ
সহকারী পরিচালক
অফিস অব দি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স
ফোকাল পয়েন্ট-এপিএ, বিইউপি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর প্রেক্ষাপট

সরকারি প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর দক্ষ, গতিশীল ও কার্যকর করার মাধ্যমে কর্মসম্পাদনের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে কর্মসম্পাদন চুক্তি চালু করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রথমবারের মতো ২০১৪-২০১৫ সালে প্রথম পর্যায়ে দেশের সরকারি ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) স্বাক্ষরের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে এপিএ এর কার্যক্রম চালু করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল। সরকারি কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে সকল সরকারি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি সহ সরকারের আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়েও এপিএ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের ন্যায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (বিমক) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এপিএ স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর শুরু করে বর্তমানে দেশের ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইউজিসি এপিএ স্বাক্ষর এবং সে মোতাবেক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কী

একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট অর্থবছরে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তার লিখিত বিবরণ সম্বলিত সমঝোতা দলিলই হলো বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহ ও কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ উল্লেখ থাকে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাগ/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উদ্দেশ্য

প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অধিকতর সম্প্রসারণ, উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, উচ্চশিক্ষার গবেষণাকে বিশ্বমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষদ/ইনস্টিটিউট/বিভাগ/শাখা/সেল সহ সকল দপ্তর সমূহের দক্ষতার

উন্নয়ন ও কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন; স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাদিহি বৃদ্ধি এবং নিশ্চিত করা; কর্মসম্পাদনকে পদ্ধতি নির্ভর হতে ফলাফল নির্ভর করা; সম্পদের যথাযথ ব্যবহার; বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদিত সার্বিক কর্মকাণ্ডের নিবিড় পরিবীক্ষণ, বস্তুনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন করাসহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী রূপকল্প, নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এপিএ'র মূল্য লক্ষ্য।

এপিএ প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

প্রণয়ন: এপিএ প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার কার্যক্রম আরম্ভ হয় এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অর্থবছরের শুরুতে এপিএ প্রণয়নের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকাল পয়েন্টগণ মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত নির্দিষ্ট সময়ে প্রযোজ্য এপিএ আদেশ, নীতিমালা এবং এপিএ সংক্রান্ত নির্দেশিকার আলোকে এপিএ প্রণয়ন করে থাকে। এপিএ প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিশন, মিশন, বিভিন্ন দপ্তরের কার্যতালিকা বা বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা, সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২০-২৫), রূপকল্প-২০৪১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪০), বদ্বীপ পরিকল্পনা (ডেল্টা প্লান)-২১০০, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, মুজিববর্ষ সহ প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। অর্থবছরের ভিত্তিতে এপিএ প্রণয়ন করা হয়। এপিএ কাঠামোতে বর্তমানে কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ও প্রস্তাবনা, বিষয় ভিত্তিক তিনটি (০৩) সেকশন ও ৮টি সংযোজনী রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসম্পাদনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয় সার্বিক চিত্র অংশটিতে। এছাড়া, এই অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ৩ (তিন) বছরের প্রধান অর্জনসমূহ, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ, সমস্যা/চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিবেচ্য অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হয়।

সেকশন-১ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী উল্লেখ থাকে, সেকশন-২ এ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব লিপিবদ্ধ থাকে এবং সেকশন-৩ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরের সার্বিক কর্মপরিকল্পনা এবং তা অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা লিপিবদ্ধ থাকে। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে SMART টেকনিকটি অনুসরণ করা জরুরি যেখানে S-মানে সুনির্দিষ্ট (Specific), M-মানে পরিমাপযোগ্য (Measurable), A-মানে অর্জনযোগ্য (Attainable), R-মানে বাস্তবমুখী (Realistic) ও T-মানে সময়াবদ্ধ (Time bound)।

সেকশন-৩ এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়-(১) প্রথম ভাগে ঐচ্ছিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি করা হয় এবং (২) দ্বিতীয় ভাগে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। বর্তমানে এপিএ তে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণিত ৫টি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে-(১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, (২) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনা, (৩) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা পরিকল্পনা, (৪) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা এবং (৫) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিএ টীম এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঐচ্ছিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করে SMART টেকনিক অনুসরণ পূর্বক প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে খসড়া এপিএ প্রস্তুত করে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে চূড়ান্ত এপিএ এপিএএমএস (APAMS) সফটওয়্যারে দাখিল করে।

উল্লেখ্য যে, অনলাইনে চূড়ান্ত এপিএ দাখিল এবং চুক্তি স্বাক্ষরের পর কোনো প্রকার সংশোধনী থাকলে তা প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করার পূর্বেই (সম্ভাব্য সেপ্টেম্বর মাসে) একবার সংশোধনের সুযোগ থাকে তবে এই সংশোধনের পরিমাণ মূল চুক্তির দশ শতাংশের (১০%) বেশি নয়।

পরিবীক্ষণ: অনলাইনে চূড়ান্ত এপিএ দাখিল এবং চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিএ টিম ও ফোকাল পয়েন্ট এপিএ বাস্তবায়নে তৎপর থাকে। এপিএ টিম নির্দিষ্ট অর্থবছরে ৬টি মাসিক সভা করে এপিএ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে। প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর ১ (এক) টি করে ত্রৈমাসিক এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল অফিস থেকে প্রমাণকসহ সংগ্রহ করে

এপিএএমএস (APAMS) সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়। এভাবে ৪টি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এক অর্থবছরে সংগ্রহ ও দাখিলসহ চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন APAMS সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়। এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও তথ্য সেবা প্রদান এপিএ টিম করে থাকে।

মূল্যায়ন: নির্দিষ্ট অর্থবছরের ১ জুলাই হতে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়কালে চুক্তি মোতাবেক ঐচ্ছিক ও আবশ্যিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ ৪টি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকাল পয়েন্টগণ অনলাইনে APAMS সফটওয়্যারে দাখিল করে থাকে। APAMS সফটওয়্যার এপিএ'র কার্যক্রম কে ১০০ মার্ক/ওয়েটেজ এর ভিত্তিতে অটোমেটিক্যালি মূল্যায়ন করে থাকে। বর্তমানে ১০০ মার্ক/ওয়েটেজের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ঐচ্ছিক লক্ষ্যমাত্রার জন্য বরাদ্দ ৭০ এবং আবশ্যিক লক্ষ্যমাত্রার জন্য বরাদ্দ ৩০। আবশ্যিক লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে -(১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার জন্য-১০, (২) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনার জন্য-১০, (৩) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা পরিকল্পনার জন্য-৩, (৪) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনার জন্য-৪ এবং (৫) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার জন্য-৩ ওয়েটেজ বরাদ্দ। অর্থবছর শেষে চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাযথ প্রমাণকসহ অনলাইনে দাখিলের পর সফটওয়্যার অটোমেটিক্যালি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ১০০ মার্ক/ওয়েটেজের মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট অর্জিত/প্রাপ্ত নম্বর দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রদান করে থাকে। আর এভাবেই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় তথা সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের এপিএ কার্যক্রমের মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এপিএ প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। এ বিষয়টি সামনে রেখে এপিএ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে ডিজিটাল মাধ্যমে এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এপিএএমএস (APAMS) সফটওয়্যার প্রবর্তন করা হয় যার অনলাইন ঠিকানা হলো- www.apams.cabinet.gov.bd। বর্তমানে এই সফটওয়্যারটি এপিএ সংক্রান্ত সকল তথ্যের আধার হিসাবে কাজ করছে এবং এপিএ প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমকে দক্ষ, কার্যকর ও গতিশীল করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এপিএ'র ভূমিকা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকৃতির উন্নয়ন সাধনেই কাজ করছে না বরং সুশাসন নিশ্চিতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। নির্দিষ্ট অর্থবছরের শুরুতেই একটি প্রতিষ্ঠান তার উর্ধ্বতন দপ্তরের সাথে কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে চুক্তিটি ওয়েবসাইটে আপলোড করছে। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান আগামী এক বছর তার সক্ষমতার ভিত্তিতে কী কী কার্যক্রম করবে এবং কী কী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সকলের জানা সম্ভব হচ্ছে, যা একটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে। এপিএ'র মাধ্যমে বছর শেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হয়। ফলে এটি একটি প্রতিষ্ঠানের কাজের জবাবদিহি নিশ্চিতের জন্য একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

এছাড়া, এপিএ তে ১০০ নাম্বারের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের কাজের সার্বিক মূল্যায়ন করা হয় যেখানে বর্তমানে আবশ্যিক লক্ষ্যমাত্রার ৩০ নাম্বার সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত থাকে। এসকল কার্যক্রমের উল্লেখ্যযোগ্য হলো: প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার চর্চা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যকরকরণ, তথ্য বাতায়নে বিস্তারিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, ই-নথি ব্যবহার ও সেবা গ্রহীতার ভোগান্তি লাঘব ও সেবা গ্রহণে খরচ ও সময় কমানো, সেবা সহজিকরণ ইত্যাদি। পাশাপাশি জনস্বার্থে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন,

ক্রয় পরিকল্পনা এবং অডিট নিষ্পত্তির মত কার্যক্রমসমূহে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয় যা একটি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এপিএ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

বিশ্ববিদ্যালয়ে এপিএ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: যথাযথভাবে এপিএ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তসমূহের সক্ষমতার অভাব, দপ্তসমূহ কর্তৃক সহজ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রবণতা, এপিএ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে দুর্বলতা, এপিএ'র আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের গুনগত মান নিশ্চিত করা, কর্মচারিগণের ব্যক্তিগত কর্মসম্পাদনের সঙ্গে এপিএ'র সংযোগ স্থাপন ও যথাযথ প্রণোদনার অভাব এবং প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এপিএ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা কম থাকা ও এপিএ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন/কম গুরুত্বারোপ করার প্রবণতা।

এপিএ'র সফল বাস্তবায়নে করণীয়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি দপ্তরের বিদ্যমান কর্মকৌশল পর্যালোচনা করে এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, দপ্তরের এপিএ সংশ্লিষ্ট জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা, এপিএ'র সঙ্গে কর্মচারিগণের ব্যক্তিগত কর্মসম্পাদনের সংযোগ স্থাপন, এপিএ'র আওতায় সম্পাদিত কাজের গুনগত মান নির্ধারণের লক্ষ্যে কৌশল নির্ধারণ ও এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদান।

উপসংহার

উন্নয়নের পাশাপাশি অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলছে আমাদের বাংলাদেশ। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা কে আরও বেগবান করার অন্যতম সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ তথা বিশ্ববিদ্যালয়। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমকে গতিশীল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন যথাযথভাবে এপিএ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। ভবিষ্যতে এপিএ চুক্তি বাস্তবায়নের সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি দপ্তর/সংস্থার বাজেট বরাদ্দের সম্ভাবনা রয়েছে, যাকে এক কথায় কর্মসম্পাদন ভিত্তিক বাজেট (Performance Based Budgeting) বলা হয়।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এপিএ'র ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করলে প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন যেমন সহজ হবে, তেমনি সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ সরকারের বিভিন্ন মেয়াদী রূপকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। সত্যিকার অর্থে গড়ে উঠবে স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা শোষণমুক্ত-বৈষম্যমুক্ত-মানবিক -উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

তথ্যসূত্র:

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২১-২০২২।
২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২০-২০২১।
৩. সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, নভেম্বর/২০২০।
৪. বিইউপি'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২০-২০২১।
৫. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (https://cabinet.gov.bd)
৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর (https://bsmrau.edu.bd)

রক্তিম গোধূলি

জান্নাতুল ফেরদৌস
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ইকনোমিক্স

রাত্রি আজ খুব সুন্দর করে সেজেছে। চোখে ঘন কালো কাজল, কপালে খুব সাবধানে বসানো একটা ছোট্ট কালো টিপ। আয়নায় এক পলক নিজেকে দেখে নিলো সে। আনমনেই বলল,
"বাহ্, বেশ লাগছে তো।"

না আর দেরি করা যাবে না। ঝটপট ছোট ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো সে। দুপুর বেলা সবাই ঘুমে। এরই মধ্যে বের হতে হবে তার, সবার চোখের আড়ালে। বাইরের ঘরে এসেই তমার সামনে পরলো সে। এক পলক রাত্রি কে দেখে তমা রহস্যের হাসি হেসে বলল,

"কিরে, শফিক ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিস? কখন ফিরবি রে আপু? মা কিন্তু ঘুম থেকে উঠে তোকে না দেখলে খুব রাগ করবে।"

রাত্রি মুখে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলো যেন আস্তে কথা বলে। ফিসফিস করে বলল, "তাড়াতাড়ি চলে আসব রে। একটু সামলে নিশ।" জলদি পা চালিয়ে বের হয়ে এলো রাত্রি। যাক, খুব সহজেই বের হতে পেরেছে আজ। তমা ছাড়া আর কারো চোখে পড়েনি এতেই খুশি সে। যদিও এভাবে সবার চোখের আড়ালে আরো বহুবার বেরিয়েছে সে। অভ্যেস আছে তার এসবে।

রাত্রি থাকে তার মামার সংসারে। খুব ছোটবেলাতেই বাবা মা কে হারিয়েছিলো সে। এরপর মামার সংসারে আশ্রয় হয় তার। মামি শুরু থেকেই তাকে পছন্দ করতো না। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে অবাঞ্ছিতভাবে আরেকজন নতুন সদস্য এলে কারোরই হয়ত সহজভাবে নেওয়ার কথা নয়। শুরুতে মামা তাকে পছন্দ করলেও ধীরে ধীরে তার কাছেও সে বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছে। যতো দিন গেছে তার জন্য খরচও নিশ্চয় বেড়েছিলো এই পরিবারটির। পড়াশোনায় রাত্রি কখনোই খুব খারাপ ছিলো না। ভার্সিটিতে পড়ার স্বপ্ন ছিলো তবে ফর্ম কেনার টাকা চাইতে ইচ্ছে করলো না মামার কাছে। নিম্নমধ্যবিত্ত এই পরিবার যে এখনো তাকে থাকতে দিচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, পড়াচ্ছে এই তো ঢের। মামার বয়স হয়েছে। পেনশনের টাকায় এই পরিবারটি চালাতে খুব হিমশিম খেতে হচ্ছে মামার। দেনার বোঝা বাড়ছে দিন দিন। এসব কিছুর মধ্যেও এই পরিবারের ছোট্ট মেয়েটি তাকে খুব ভালোবাসে। তমার জন্যই এই পরিবারটিকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে রাত্রির।

গলির মাথায় এসেই জামিল ভাইয়ের সাথে দেখা। একে ভাই বলা ঠিক হবে কিনা তা নিয়ে অনেক দ্বিধা আছে রাত্রির মনে। বয়স ৪০ এর কাছাকাছি। রাত্রিকে দেখেই জামিল পান খাওয়া দাত বের করে বীভৎস হাসি দিলো।
--কই যাও রাত্রি?
-বান্ধবীর বাসায়।
-বান্ধবীর বাসায় বেশি ঘন ঘন যাওয়া ঠিক না। কম যাবা।
-আচ্ছা।

রাত্রি জামিল কে কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে দ্রুত হেটে চলে গেল। একবারও পিছনে ফিরে তাকালো না। লোকটা তার পিছনে পিছনে না আসলেই হয়। পিছনে ফিরে তাকালে রাত্রি দেখতে পেত জামিল নামের লোকটি কিভাবে হতাশ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। পানের রস তার ঠোঁটের কোণা থেকে গাল বেয়ে পড়ছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। এই লোকটা থেকেই মামা ধার দেনা করেন। বাজারে অনেক গুলো দোকান আছে এর। পাঁচতলা বাড়ি আছে একটা। এসবের কিছুই লোকটার নিজের নয়। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া। তার প্রধান কাজ রাস্তায় ঘোরা এবং এলাকার কে কি করছে তা নিয়ে মাথা ঘামানো। বিয়ে করেছিলো একটা। বউকে মারধোর করতো বলে বউ চলে গেছে। মামার অনেক দেনা হয়েছে লোকটার কাছে। রাত্রি যতদূর জানে মামা এর সাথে রাত্রির বিয়ে দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে, এই শর্তে যে মামার সকল দেনার টাকা মাফ করে দিবে সে এবং মামার পরিবারের দায়িত্ব নেবে। এর মধ্যে অনেক বার রাত্রিকে এই নিয়ে বোঝানো হয়েছে। রাত্রি হ্যাঁ না কিছুই বলে নি। শুধু শফিককে জানিয়েছে ব্যাপারটা। এই কারণেই বিয়ে নিয়ে এতো তাড়াহুড়ো শফিকের।

আজ তারা যাচ্ছে টুকটাক কেনাকাটা করতে। কাল কাজী অফিসে বিয়ে হবে তাদের। "বিয়ে" শব্দটা কতো অদ্ভুত। এই একটা শব্দের জোরেই কাল থেকে নতুন জীবন শুরু হবে রাত্রি আর শফিকের। শফিক চাকরি করে একটা গার্মেন্টস কোম্পানিতে। জুনিয়র একাউন্টেন্ট পোস্টে। বেতন খুব বেশি না হলেও তারা ভালোই চালিয়ে নিতে পারবে ছোট্ট সংসারটা। একটা দুইরুম এর বাসাও খুজে ফেলেছে শফিক। এখন শফিক ম্যাচে থাকে। মা আর ছোটবোন গ্রামের বাড়িতে থাকে।

রাত্রি চারদিকে ভালো করে দেখছে। এতোক্ষণে শফিকের এসে যাওয়ার কথা। এই চার বছরে রাত্রি একদিনও শফিকের আগে আসতে পারে নি। প্রত্যেকবার শফিক কিভাবে যেন আগে এসে পড়ে। হঠাৎ রাত্রি টের পেল তার পেছনে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। পিছনে ফিরে দেখলো শফিক। হাতে বেলি ফুলের মালা। "তোমার জন্য মালা কিনতে গেছিলাম। আজ এদিকটায় মালা বিক্রি করতে দেখছি না কাওকে। মালা না পেলে তো তুমি আবার গাল ফুলিয়ে ফেলো।"-এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল শফিক। রাত্রি শফিকের হাত থেকে মালা গুলো নিয়ে বলল, "আমার কিন্তু সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরতে হবে। এমনিতেই বকা খেতে হবে।"

--আজও লুকিয়ে এসেছ?

--হ্যাঁ। তাছাড়া উপায় আছে?

--আজকের দিনই তো। কাল থেকে সব সুন্দর হবে।

শফিক রিকশা ডাকলো। রাত্রিকে বরাবরের মতো বাম সাইডে বসিয়ে নিজে ডান সাইডে বসলো। আগে রাত্রি এ নিয়ে তর্ক করতো। বাম সাইডে বসলেই যে রাত্রি সুরক্ষিত এটা মানতে নারাজ সে। শফিক কোনো যুক্তির ধারে কাছে দিয়েও যায় না এ ব্যাপারে। রাত্রিও এসব নিয়ে আর কিছু বলে না।সত্যি বলতে খারাপ লাগে না রাত্রির। কেউ তাকে নিয়ে এতটা ভাবছে এটা ভাবতেই অবাক লাগে তার। ভালোলাগা মেশানো অবাক হওয়াকে কি বলে?

রিকশা নিউ মার্কেটের দিকে চলতে থাকে। শফিক একের পর এক কথা বলতেই থাকে। কি কি কেনাকাটা করবে, কালকের বিয়ে নিয়ে পরিকল্পনা। রাত্রি শুধু অবাক হয়ে সহজসরল, বোকাসোকা ছেলেটিকে দেখে। এই চার বছরে একটু একটু করে চিনেছে শফিককে সে। ভালো খারাপ সবসময় পাশে থেকেছে। সবসময় চুপচাপ থাকা ছেলেটা তার কাছে এলেই কিভাবে এতো কথা বলে ভেবে পায় না রাত্রি। মনে পড়ে যায় সেসব দিনের কথা যখন শফিক শুধুই লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্রিকে দেখতো। রাত্রি ঠিকই খেয়াল করেছিলো ব্যাপারটা। খেয়াল করেছিলো আরো অনেকে। দুই বছরে নিজের মনের কথা বলতে না পারা শফিককে রাত্রিই প্রথম জিজ্ঞেস করেছিলো কিছু বলতে চায় কি না। চার বছর আগের সেদিনটায় শফিকের মুখটা কিরকম লাল হয়ে গেছিলো। ভাবতেই হাসি পায় সেদিনের কথা।

নিউ মার্কেট থেকে শফিক একটা লাল শাড়ি কিনে দিয়েছে রাত্রিকে। বেশ ভালো শাড়ি। বেনারসি কেনার সামর্থ্য না থাকলেও এই শাড়ি রাত্রির কাছে বেনারসির চেয়ে অনেক দামি। তার সাথে লাল কাঁচের চুড়ি, একজোড়া কানের ঝুমকা আর একপাতা লাল টিপ। এই তার বিয়ের সাজসজ্জা। রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে গেছে রাত্রি তখন নিজের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ছোট একটা ব্যাগে গুছিয়ে নিল। এরপর খাতা কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো। বিদায়ী চিঠি। যদিও সে চলে গেলে এই পরিবারটির খুশি হওয়ারই কথা। তবুও যারা এতোদিন তাকে আশ্রয় দিলো তাদেরকে কিছু না জানিয়ে চলে যেতে মন সায় দিচ্ছে না রাত্রির। অল্প কথায় একটা ছোট্ট চিরকুট লিখে ব্যাগে লুকিয়ে রেখে শুতে গেল রাত্রি। ঘুম হলো না রাত্রির। ভয়, আনন্দ, উত্তেজনার মিশ্র এক অনুভূতি নিয়ে রাত পার করে দিলো সে।

পরদিন সকালে রোজকার নিয়মেই সব চলতে থাকলো। শুধু পরিবর্তনটা আজ রাত্রির ভেতর। দুপুরে ঠিকমতো কিছু খেতে পারলো না রাত্রি। সবাই যখন দুপুরে বিশ্রাম নিতে গেল রাত্রি তখন ফটপট তৈরি হয়ে ছোট্ট ব্যাগটা কাধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাসা থেকে। না আজকে আর কেউ দেখেনি তাকে। খাটের পাশের টেবিলটায় চিরকুটটা রেখে এসেছে সে। আর কারো নজরে না পড়লেও তমার নজরে ঠিকই পড়বে। সময়মতোই পৌছে গেছে রাত্রি আগের দিনের ঠিক করা জায়গায়। এখান থেকে শফিক তাকে কাজী অফিসে নিয়ে যাবে। আজ রাত্রি আগে এসেছে। এর আগে এমনটা ঘটে নি কখনো। কথা ছিলো শফিক আজও অফিস করবে। আজ হাফ ছুটি এবং পরের তিন দিন মিলে সাড়ে তিনদিনের ছুটি আগে থেকেই নিয়ে রেখেছে শফিক। বিয়ে করেই গ্রামের বাড়ি চলে যাবে তারা।

অনেক্ষণ হলো রাত্রি একা দাঁড়িয়ে আছে। শফিক কখনো এতোটা দেরি করে না। আজ কি হলো?
রাত্রি দাড়িয়ে আছে সেই দুপুর থেকে। এখন বিকেল। আরেকটু পরেই সন্ধ্যা হবে। শফিক এখনো আসে নি। কান্না পাচ্ছে রাত্রির। আসে পাশের মানুষ অবাক হয়ে লাল শাড়ি পড়ে একা দাড়িয়ে থাকা এই তরুণীকে দেখছে। দুপুর থেকে একি ভাবে এক জায়গায় সেজেগুজে কোনো মেয়ে একা দাড়িয়ে থাকলে কৌতুহল হওয়ারই কথা মানুষের। শফিক আসছে না কেনো এটাও বুঝতে পারছে না রাত্রি। তবে কি শফিক আসবে না? কিন্তু শফিক এমন ছেলেই নয়। আচ্ছা হয়ত অফিসেই কোনো কাজে আটকে পড়েছে শফিক। ধুর, এতোক্ষন এটা মাথায় আসলো না কেনো? নিজের উপরই কিছুটা বিরক্ত হলো রাত্রি।আচ্ছা শফিকের অফিসে চলে গেলে কেমন হয়? শফিকের যদি কাজ বেশি থাকে সে না হয় রিসিপশনে অপেক্ষা করবে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে এই ভালো। এর আগে একবার শফিকের অফিসের সামনে পর্যন্ত গিয়েছিলো রাত্রি। এখান থেকে দূরে নয়। রিকশায় গেলে হয়তো ২০ মিনিট লাগবে। আর দেরি না করে রাত্রি রিকশায় উঠে বসলো। এই কয়েক ঘন্টা রাত্রির কাছে কয়েক বছরের মতো মনে হয়েছে। অপেক্ষা করা আসলেই কষ্টকর। শফিক কি করে প্রতিদিন তার জন্য এতক্ষন হাসিমুখে অপেক্ষা করতো ভেবে পেল না রাত্রি। তবে আজ শফিকের অনেক বকা খেতে হবে। কান্ডজ্ঞানহীনের মতো কিভাবে এতোক্ষন অপেক্ষা করাতে পারলো রাত্রিকে সে? এরই জবাব চাইবে রাত্রি। দেখতে দেখতে অফিসের কাছাকাছি চলে এসেছে রিকশা। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে সামনে অনেক জ্যাম। এতো মানুষ কি করছে এখানে? এই জ্যামের কারণেই দেরি হয় নি তো শফিকের? ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে। কোনো একটা বিল্ডিং থেকে বের হচ্ছে ধোঁয়া। আরেহ্ মনে হচ্ছে আগুন লেগেছে! শফিক কি আগুন নেভানোর কাজে সাহায্য করতে গিয়েই আটকে গেছে? এধরণের কাজে তো সে সবার আগে যায়। এমনটা হলে রাত্রির আর বলার কিছু থাকবে না। তাদের বিয়েটা কালও হতে পারে। তা নিয়ে সমস্যা নেই। ভীড়ের কাছাকাছি গিয়ে রিকশা থেমে গেলো। এখান থেকে আর যাওয়া যাবে না রিকশায়। ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়লো রাত্রি। ধোঁয়ায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আগুন কোন বিল্ডিংয়ে লেগেছে। সবগুলো বিল্ডিংই এতো কাছাকাছি। ভীড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো রাত্রি। অনেক কষ্টে কিছুটা সামনে এগিয়ে গেলো সে। লোকজনের চিল্লাচিল্লি, কান্না, আহাজারি তে চারিদিক কেমন হয়ে আছে। ভালো করে তাকাতেই রাত্রি দেখলো নীল বিল্ডিংটায় আগুন লেগেছে। ফায়ারব্রিগেড আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে এতোক্ষন যে ভাবনাটি একবারো আসেনি রাত্রির মনে সেই অশুভ ভাবনাটিতেই তার মন ছেয়ে গেছে এক নিমিষেই। শফিক এই বিল্ডিংটি দেখিয়েই তো বলেছিলো এটা তার অফিস। নাকি পাশের সাদা বিল্ডিংটা? মনে করতে পারছে না রাত্রি।চিন্তা করতে পারছে না সে কিছু। নাহ, শফিক এই বিল্ডিংটাই দেখিয়েছিলো তাকে। রাত্রির সারা শরীর যেন অসাড় হয়ে আসছে খুব বাজে একটা চিন্তায়। ভাবতে পারছে না সে কিছু। হঠাৎ করেই সে ভীড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগলো আর শফিক শফিক বলে ডাকতে লাগল। আশে পাশের মানুষ মনোযোগ দিয়ে দেখছে তাকে। জায়গা করে দিচ্ছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। সে কার কাছে যাবে এখন? কাকে জিজ্ঞেস করবে শফিক কোথায়? কিছু বুঝতে পারছিলো না রাত্রি। শুধু সামনে গিয়ে শফিক শফিক বলে জোরে ডাকছিলো সে। তার গাল বেয়ে যে অজান্তেই চোখের পানি পড়ে চলেছে তা এতোক্ষণে খেয়াল হয়েছে রাত্রির। কাঁদছে সে। কেনো কাঁদছে? শফিকের তো কিছু হয় নি। হয়তো দেখবে এখানেই কোথাও শফিক দাঁড়িয়ে আছে অন্যদের সাথে।

আবার জোরে শফিকের নাম ধরে ডাকতে লাগলো সে।

পেছন থেকে একজোড়া হাত তাকে শক্ত করে ধরলো তখনি। একটা মেয়ে দাড়িয়ে আছে তার পেছনে। গালে কালি মাখা, বিধ্বস্ত অবস্থা।

মেয়েটি বলল, "আপনি রাত্রি?" জবাবে রাত্রি মাথা নাড়লো। মেয়েটি রাত্রিকে টেনে একপাশে নিয়ে এলো। বলল, "শফিক ভাই আমাদের সাথেই কাজ করতো। আপনার কথা বলেছিলো আমাকে। "এই বলেই চুপ করে গেল মেয়েটি। রাত্রি এতোক্ষন ধৈর্য

ধরে শুনছিলো মেয়েটির কথা। এবার জিজ্ঞেস করলো, "শফিক কোথায়? "মেয়েটি রাত্রিকে শক্ত করে ধরলো, বলল, " শফিক ভাই আর নেই। আগুন লেগেছে সেই ২ টা বাজে। ৩.৩০ এই শফিক ভাইয়ের মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে তখনি। "রাত্রি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। এক নিমিষেই সব শেষ হয়ে গেল রাত্রির। মেয়েটি রাত্রিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। রাত্রি বুঝতে পারছে মেয়েটি কাঁদছে। রাত্রির কান্না পাচ্ছে না। কোনো অনুভূতি নেই তার। আস্তে আস্তে উঠে দাড়ালো সে। দ্বিতীয় বার ঘুরে তাকালো না আর মেয়েটির দিকে। রাত্রি হাটছে। হাটছে এলোমেলোভাবে। তার জীবন আজ বদলে যাওয়ার কথা ছিলো। আসলেই বদলে গেছে। পেছন থেকে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে। লাল শাড়ি পড়া একটা মেয়ে এলোমেলোভাবে ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। গোধুলির আলো আর শাড়ির লাল রঙের আভায় কেমন রহস্যময়ী লাগছে তাকে। রাত্রি হেটে যাচ্ছে রহস্যময়তার মাঝে, অজানা এক গন্তব্যে!

অপেক্ষা

আশিকুর রহমান
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম

আগামী পরশু ঈদ। রাহেলা বেগম অপেক্ষা করছে ঢাকা হতে একমাত্র ছেলের বাড়ি ফেরার জন্য।
চোখে কালো চশমা আর হাতে একটা লাঠি নিয়ে বারান্দায় তিনি পায়চারী করে যাচ্ছেন সেই সকাল হতে।
আজকেই বউ, সন্তানসহ বাড়িতে আসবে ছেলেটি।
গ্রামের বাড়িতে রাহেলা বেগম আর তার স্বামীই শুধু থাকেন, সাথে আছে কাজের মেয়ে মিলি।
বাসার রান্না বান্না হতে সব কাজ মিলি-ই করছে গত একবছর।
ছেলে অনেকবারই মা-বাবা কে শহরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তার মা নাছোড়বান্দা, গ্রামের হাওয়া বাতাস, বুনো ফুলের গন্ধই তার ভালো লাগে ভীষণ।
রাহেলা বেগম চোখে দেখেন না একটা এক্সিডেন্ট এর পর থেকে।
শেষ গত ঈদে তিনি সবার মুখ একসাথে দেখেছেন কিন্তু এবারের ঈদ টা ভিন্ন।
সকাল গড়িয়ে কড়া রোদে দুপুর নেমেছে, হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠে।
মিলি মোবাইলটা নিয়ে দৌড়ে এসে জানায়:
খালাম্মা, ভাইজান ফোন দিছে। রিসিভ করে কানে দেই?
-হ্যা হ্যা, দে দে।
মিলি কানে ফোন ধরে রাখে, রাহেলা বেগম বেশ অপেক্ষার উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করে:
-হ্যালো, আজাদ। কতদূর এলিরে তোরা? সব ঠিক আছে তো?
ফোনের ওপার হতে শোনা যায় ১০ বছরের নাতনি অহনার গলা।

মিষ্টি স্বরে সে তার দাদীকে জানায়:

দাদী আমি তোমার অহনা, আরেকটু পরেই লঞ্চে উঠবো। ভালো লাগছিলো না তাই তোমাকে ফোন দিলাম। আমি এসেই কিন্তু কাচা আমের ভর্তা খাবো।

রাহেলা বেগম হেসে দিয়ে উত্তর দেয়:

-আচ্ছা আগে আসো তো। আরো কতকিছু করে খাওয়াবো তোমাদের।
-কিন্তু দাদী তুমি তো এখন চোখে দেখতে পাওনা, আর মিলির হাতের খাবার আমার একদম ভালো লাগেনা।
রাহেলা বেগমের ভেতরটা কষ্টে হু হু করে উঠে।
এই তিনিই যখন সুস্থ ছিলেন, কতকিছু নিজ হাতেই রান্না করেছেন ছেলে বউ আর নাতনির জন্য।
কত রকম পিঠা, পায়েস, মোয়া, চালের রুটি, হাসের গোস্ত।
অহনার কথাটা শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, অন্ধ কোটরে স্মৃতিরা জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো।

এরপর আবার বললেন:
-তোমরা আসো, আমার হাতেই করে খাওয়াবো সব কিছু।
অহনা উল্লসিত হয়ে জানায়:
-ইয়ে, অনেক মজা হবে। আচ্ছা দাদী রাখি এখন, লঞ্চে উঠবো সবাই।
-আচ্ছা রাখো, সাবধানে আসো। আল্লাহ হাফেজ।

ফোন টা রেখে রাহেলা বেগম বারান্দায় রাখা চেয়ারটিতে বসলেন।

মিলিকে বললেন বাড়ির পাশের আম বাগান হতে কিছু আম পেড়ে আনতে।
মিলি ছুটে গেলো কিছু আম ছিড়ে আনতে।
হঠাৎ আকাশে গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে উঠলো, শীতল হাওয়া এসে লাগলো রাহেলা বেগমের শরীরে সাথে বয়ে আনলো নানা স্মৃতি।
নিজের শৈশব, দুরন্তপনার কিশোরী বেলা জাপ্টে ধরলো রাহেলা বেগমকে। কিছুক্ষণ কেটে গেলো এভাবেই,
হঠাৎ আবার ফোন এলো, নিজের স্মৃতির সম্মোহন কেটে গিয়ে পাশে হাতড়িয়ে ফোনটা ধরলেন।
অজানা এক আতংক চেপে বসেছে তাকে,
ফোন ধরে কানে নিতেই হইচই এর আওয়াজ, ব্যাকুল হয়ে উঠলো তার প্রতিক্ষায় থাকা হৃদয়। আবারো অহনার কণ্ঠ শোনা যায়, কান্না জড়ানো ভয়ার্ত মিষ্টি এক স্বর
-দাদী আমার অনেক ভয় করছে, লঞ্চটা খালি দুল খাচ্ছে দাদী। দাদী আমাদের জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করো। আব্বু আর আম্মু আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে।
রাহেলা বেগম উতলা হয়ে উঠেন, নিজের কান্না সামলিয়ে অভয় দিতে থাকেন:

-ইনশা-আল্লাহ কিচ্ছু হবেনা দাদু। তুমি ভয় পেও না আল্লাহ আল্লাহ করো। সব ঠিক হয়ে যাবে।
-দাদী আমি তো সাতার পারি না, এবার বাড়িতে যদি আসতে পারি তুমি আমাকে সাতার শেখাবে তো?
- অবশ্যই দাদু, অবশ্যই।
বলতে বলতেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
রাহেলা বেগমের অন্ধ কোটর হতে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে।

ঝড়ের তীব্রতা বাড়ছে, তিনি হাত উঁচিয়ে করুণাময়ের দরবারে আর্জি জানান, তিনি যেনো সব ঠিক করে দেন, ওরা যেনো সহিহ সালামতে নীড়ে ফিরতে পারেন।
কিন্তু ঝড়ের তীব্রতা যেনো থামছেই না, রুদ্র কাল বৈশাখির মত্ত ঝাপটায় নারিকেল গাছ গুলো যেনো উন্মাদ নেচে যাচ্ছে।
রাহেলা বেগম ওদের পাতায় পাতায় ঘর্ষণের শব্দে যেনো সব দেখতে পায় স্পষ্ট।
বাড়ির সামনেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ৪টি নারিকেল গাছ তার পাশে মাথা উঁচু করে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে দুটি পেয়ারা গাছ।

মিলি মিলি বলে ডাকতে থাকেন তিনি, ফোনটা যে কেটে গেলো এভাবে, আবারো ফোন করতে চাইলেন।
মিলি জামার কোরসে করে অনেক গুলো আম নিয়ে এসেছে।এক গাল হেসে দিয়ে জানায়:

- খালাম্মা আম আমার পাড়ার আগেই পড়ে গেছে। ধইরা দেহেন কত বড় আম।
রাহেলা বেগম মেজাজ হারান, ধমক দিয়ে বলেন:
-এখনি ফোন কর, আজাদকে।
বলতে বলতেই কণ্ঠে কান্নারা শিউলি ফুলের মত ঝরে যায়। তোতলানো স্বরে আড়ষ্ট হয় কণ্ঠ।
মিলি জিজ্ঞেস করে:
-খালাম্মা, কি হইছে খালাম্মা ও খালাম্মা?
-আরে আগে ফোন কর!
মিলি রিসিভড কল লিস্ট হতে ফোন করে নাম্বারে কিন্তু ওপার হতে শোনা যায়:
"এই মূহুর্তে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা"

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত গলায় রাহেলা বেগম মিলিকে জানায়:
-ওদের লঞ্চ ঝড়ের মধ্যে পড়েছে। আমাকে ফোন দিছিলো নাতনিটা। আহারে আমার অহনা,আহারে আমার আজাদ।
রাহেলা বেগমের আহাজারিতে যেনো ঝড় শান্ত হয়, আশেপাশের প্রতিবেশীরা ছুটে আসে।
এদিকে তার স্বামীও বাজার থেকে ততোক্ষণে ফিরেছে। সব শুনে তিনি আজাদের স্ত্রীর নাম্বারেও ফোন দেয় কিন্তু তার ফোনও বন্ধ দেখাচ্ছে।
আশেপাশের প্রতিবেশীরা সান্ত্বনা দিতে থাকে, সাহস দিতে থাকে রাহেলা বেগম ও তার পরিবারকে।
তার স্বামীও সব শুনে নিজেকে সামলে অন্ধ স্ত্রীর চোখে হাত ছুয়ে অশ্রু মুছে দিয়ে শক্ত হতে বলে।
এক প্রতিবেশী জানায়:
-বুবুজান, নেটওয়ার্কের সমস্যাও তো হইতে পারে। আপনি এত দুশ্চিন্তা কইরেন নাতো। ইনশাআল্লাহ ওরা ঠিকমতোই ফিরবে।

আকাশের মেঘ কেটে গিয়েছে আবার উঁকি দিচ্ছে নিষ্প্রভ সূর্য। নিস্তব্ধতায় ঢেকে গেছে চারপাশ, প্রতিবেশীরা ফিরে গেছে যার যার ঘরে।বিকেল গড়িয়ে আসছে, সবাই ইফতারি বানাতে ব্যস্ত।
মিলি রাহেলার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে:
-খালাম্মা, ইফতারি কি কি বানাবো?
রাহেলা কোনো কথা বলে না, একদম বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন। অনেক ডাকের পরে অস্ফুট স্বরে জানালেন:
-যা ইচ্ছা বানা। বেশি করে বানাইস ওরা তিনজন আসছে।

কথাটা বলতে না বলতেই, বিদ্যুৎ আসে। ফ্যানের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারেন তিনি।
চেয়ার ছেড়ে উঠেই, মিলিকে নিয়ে টিভি ছাড়তে বলেন।
নিউজ চ্যানেলের নীচে সংবাদ শিরোনাম পড়ে শোনাতে বলেন।
মিলি অল্প পড়ালেখা শেখা গ্রামের মেয়ে, টিভি স্ক্রিনের খুব কাছে গিয়ে ভেংগে ভেংগে খবর গুলো.....

নিভৃতচারীর আর্তনাদ

মো: কাইয়ুম আলী
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

আজ চারিদিকে হৈ চৈ। ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে চলা
পদযুগল,
তাকিয়ে দেখ নগরীর এক প্রান্তে বেড়ে ওঠা সজীব
ফুলও আজ তোমাদের অবহেলায় শুকনো,
রসহীন!
বাতাসের ধাক্কায় ঢলে পড়া ফুল আজ স্পর্শ খোঁজে:
শীতল স্পর্শ।
নগরী আজ মিছে হাসিমুখে ছেয়ে আছে,
ঢলে পড়া সূর্য কেউ দেখে না, রাতের আঁধার দেখে না কেউ,
দেখে না বিদ্যুতের তারে জায়গা করে নেওয়া দুটো পাখিকে।
পথের আহত কুকুরটাও জানে না, তাকে দেখার কেউ নেই।
জানে না কেউই,
ধেয়ে চলা দাবানলের মত এই নগরীতে একটি হাতের
আশা করাটাই বোকামি।
একাও তুমি নও,
কাঁচের জানালা ভেদ করে আসা আলো
তোমার সঙ্গী।
স্তব্ধতা, নির্জনতা তোমার সঙ্গী।
রাতের ঘুটঘুটে আঁধার তোমার সঙ্গী।
এর বেশি চাইলে তুমি বোকা
আমার মত-
ক্লান্ত, বিচ্ছিন্ন, নিতান্তই একা।

বনসাই

রিজাল ফাতহোনী কবীর
সহকারী প্রজেক্ট ম্যানেজার (ইলেকট্রিক্যাল)
প্রধান পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও পূর্ত অফিস

(১)

একবিংশ শতাব্দীর প্রজন্মকে তাদের জীবদ্দশায় দ্বিতীয় আরেকটি মহামারীর মুখে পড়তে হবে এমনটি কেউই ভাবে নি। কিন্তু ২০৫৪ সালে এসে হঠাৎ করেই শুরু হলো আরেক প্যান্ডেমিক। এই পৃথিবীর মানুষ এবং প্রযুক্তি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে পার করে এসেছে এক মহামারী। সুতরাং চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে এবার আর তেমন একটা প্রশ্নের মুখে পড়তে হলো না।

তবে লুবা ভাইরাস একবার যাদের শরীরে বাসা বেঁধেছে, তাদের মোটামুটি নরকবাস করিয়ে ছেড়েছে। জ্বর কিংবা তীব্র মাথাব্যথায় ক্ষান্ত হয় নি, আক্রান্ত রোগীর নাক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরিয়েছে প্রায় তিনদিন পর্যন্ত। সব মিলিয়ে রোগীদের ভোগান্তি ছাড়িয়ে গেলো অন্যান্য বেশিরভাগ রোগকেই। প্রথম একমাসেই বিশ্বজুড়ে প্রায় লাখ খানেক মানুষ মারা গেলো লুবা ভাইরাসের সংক্রমণে। তবে পূর্বের অভিজ্ঞতা থাকায়, এবার পৃথিবীর পথঘাট একেবারে শূন্য না হলেও জরুরি অবস্থা জারি হলো বলা যায়।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবীব্যাপী ভ্যাক্সিন নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। ভাইরোলজি কিংবা জেনেটিক কোডিং নিয়ে পৃথিবীতে গত বিশ-ত্রিশ বছরে অনেক কাজ হয়েছে। সে হিসেবে প্রযুক্তি এগিয়ে ছিলো অনেকটা। তবে দ্রুততার হিসেবে আগের কোভিড ভ্যাক্সিন তৈরির রেকর্ড ভেঙে গেলো এবার, এমনটিই হওয়ার কথা ছিলো। তবে আশ্চর্যেও বিষয় হলো, বিশ্বের সকল বিজ্ঞানীদের তাক লাগিয়ে ভ্যাক্সিন তৈরির কাজে নরওয়ের এক ল্যাবে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখলো বাংলাদেশের একজন রিসার্চার।

পৃথিবী ততদিনের আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে, আর প্রতিটি মানুষকে এখন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের জীবন বাঁচাতে এবার বাধ্যতামূলক করা হলো ভ্যাক্সিন। পেছনের রাজনীতি নিয়ে তেমন কেউ মাথা ঘামালো না, কারণ সবাই বাঁচতে চায়। সব মিলিয়ে মাত্র দুই মাসের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় এগারো বিলিয়ন মানুষকে টিকার আওতায় নিয়ে আসা হলো।

ফলাফলও এলো হাতেনাতে। লুবা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর সাত-আট মাসের মধ্যে পৃথিবী থেকে রোগাক্রান্ত মানুষের সংখ্যা শূন্যে নেমে আসলো। পৃথিবীর ইতিহাসে দ্রুততম সময়ে অতি-আণুবীক্ষণিক জেনেটিক কোডিং-কে পরাজিত করলো মানুষ।

(২)

২০৩৫ সালের পর বৈশ্বিক রাজনীতি আর ক্ষমতার বড় রকমের পালাবদলের পর যখন মনে হচ্ছিলো পৃথিবী একটু শান্ত হতে যাচ্ছে, অনেকটা এমন সময়েই গোটা পৃথিবীর সামনে বড় হয়ে আসলো বহু যুগের পুরনো এক সমস্যা: সীমিত সম্পদ আর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অসম প্রতিযোগিতা। ততদিনে ফুরিয়ে আসছে ভূ-গর্ভস্থ সঞ্চিত তেল-গ্যাস, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে তলিয়ে গেছে পৃথিবীর বাসযোগ্য বহু জায়গা। বাতাসে বাড়ছে লেড কিংবা তেজস্ক্রিয়তা, কখনো দুটো একসাথে। এদিকে উত্তর আফ্রিকার বিরান মরুভূমি শরীর বাড়াতে বাড়াতে বিষুবরেখা পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে ততদিনে। মানুষের আত্মবিধ্বংসী কাজের পরিণামে আর পঞ্চাশ কিংবা একশ' বছর পর বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়া পৃথিবীর কী হবে কেউ জানেনা। জনসংখ্যাকে পশ্চিমা দেশগুলো এত বছর প্রাচ্য কিংবা উপমহাদেশীয় সমস্যা বলেই ভাবতো, এবার প্রথমবারের মত তারাও বেশ অস্বস্তি নিয়ে নিজেদের

সীমারেখায় এর ব্যাপকতা টের পেলো।

বহু বছর ধরে এই বিষয়ে আরো গভীরভাবে ভাবছিলো আমরীন নাওয়ার দ্যুতি। বছরের বেশিরভাগ সময় ইউরোপে থাকলেও ঢাকায় বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কাজ করতো বাংলাদেশের এই রিসার্চার। কাজেই অল্প কিছুদিন দেশে থাকা হতো ওর, আর এই অল্প কয়েকদিনেই চারদিকে কীটপতঙ্গের মত গিজগিজ করতে থাকা মানুষের মাঝে ওর দমবন্ধ হয়ে আসতো।

মানুষের অন্তরঙ্গতা খুব একটা টানেনি আমরীনকে কখনোই। শৈশব-কৈশোরে পরিবারের সাথে স্মৃতিগুলো অস্পষ্ট হলেও খুব একটা খারাপ ছিলো না অবশ্য। কিন্তু বছর দশেক আগে একটি দুর্ঘটনা সবকিছুই পালটে দিলো। ধানমন্ডিতে এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছিলো বাবা। অনেকক্ষণ জ্যামে আটকে থাকার পর পিছন থেকে অধৈর্য এক মিনিবাস ধাক্কা দেয়ার পর রিকশা উল্টে রাস্তায় ছিটকে পড়লেন উনি। এরপরের ঘটনাটা আমরীন না শুনলেই বোধ হয় ভালো হতো।

প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটনাটি বাবাও ভুলতে পারেননি তার শেষ দিন পর্যন্ত। অবিশ্বাস্য হিংস্রতায় ফোন, মানিব্যাগ আর হাতঘড়িতে লেগে থাকা রক্ত মুছতে মুছতে এক মাঝবয়সী লোক চোখের সামনে ভীড়ের মাঝে হারিয়ে গেলো। পুরো রাস্তা জুড়ে অসংখ্য মানুষ কিংবা অমানুষ, অথচ বাবা যেন হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন এই শহরের সকল ব্যস্ততা আর কোলাহলের কাছে। এই শহুরে যন্ত্রমানবদের বেশিরভাগই এক বিশেষ ধরনের অন্ধত্বে আক্রান্ত। স্বার্থের সাথে সম্পর্কহীন যেকোনো ঘটনা দৃষ্টিসীমার একদম সামনে হলেও তারা খুব সাবধানে চোখাচোখি হওয়া এড়িয়ে হেঁটে চলে যেতে পারে।

এভাবে প্রায় চল্লিশ মিনিট রাস্তায় পড়ে থাকার পর দুই টোকাইয়ের সহায়তায় প্রায় দুই-কিলোমিটার দূরের এক হাসপাতালে পৌঁছান বাবা। সেবার হাসপাতাল পর্যন্ত যাওয়ার আগেই বাবা জীবনীশক্তির প্রায় পুরোটা খরচ করে ফেললেন, যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটি বড়জোড় সপ্তাহখানেক বাঁচিয়ে রাখলো তাকে। আমরীন তখন থেকেই বুঝতে পারছিলো, এই ধাক্কার পর মা-ও খুব বেশিদিন থাকবে না। হলোও তাই, ছয়মাসের মধ্যেই।।

এই ঘটনার পর একটা পরিবর্তন আসলো আমরীনের। খুব কাছে থেকে ওর সাথে কেউ মিশতে পারতো না বলে কেউ ব্যাপারটা সেভাবে ধরতে পারেনি। তবুও একই ল্যাবে কাজ করা ইরানের ছেলেটি একদিন গম্ভীর কিন্তু প্রচণ্ড মেধাবী এই মেয়েকে সাহস করে প্রশ্ন করেই বসলো, হেই মিস অ্যামরীন, আর ইউ ওকে?

এরপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, হার্ভার্ডে রিসার্চ ফেলো হিসেবে বছর দুয়েক কাজ করার পর আমরীন নরওয়ের অসলো ইউনিভার্সিটিতে ফুল টাইম রিসার্চার হিসেবে যোগ দেয়। হার্ভার্ডের কোলাহল ওর ভালো লাগতো না, অসলোর শান্ত ল্যাবরেটরিতে দিনরাত পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করতে থাকে ও। বহু পাবলিকেশন ছাড়াও বেশ কয়েকটি পেটেন্ট হয়েছে এর মধ্যেই, তবে ওর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গত তিন-চার বছরের কাজ। যদিও এগুলো কোনো পেপার, জার্নালে থাকবেনা, কিংবা পেটেন্ট করাও হবেনা কোনোদিনই।।

এর কিছুদিন পর খুব বড় একটা আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আমরীন প্রথম সুযোগটা পেলো। প্রায় আশিটি দেশ থেকে সেই কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলো মানুষ। শেষদিনের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে এবং ডিনারের প্রোগ্রামে পৃথিবীর সর্বপ্রথম লুবা ভাইরাসের স্যাম্পল শরীরে নিয়ে আমরীনও ছিলো সবার সাথে। মেয়েটি সাধারণত সবার সাথে এত কথা বলে না কিংবা হাসে না। তবে হাসলে যে ওকে খুব সুন্দর লাগে সেটি ঐদিন বিভিন্ন দেশের মানুষজন লক্ষ্য করলো প্রথমবার।

এরপর দ্রুততম সময়ে লুবা ভাইরাসের ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করায় আমরীন নাওয়ার দ্যুতির নাম ছড়িয়ে পড়লো সারা পৃথিবীতে। সফলভাবে হিউম্যান ট্রায়াল পার হওয়ার পর বাকিটুকু নিয়ে আর ভাবতে হয়নি। ভ্যাক্সিনের জিনোম কোডের অনুলিপি নিয়ে পৃথিবীর অন্তত বারোটা ল্যাবে প্রস্তুত করে চমৎকার এক সাপ্লাই চেইন নির্ধারণ করে দেয়া হলো। ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর আগে কোভিড প্যান্ডেমিকের সময়কার ভুলগুলো এবার কেউ করলো না।

গ্লোবাল ভ্যাক্সিনেশন প্রজেক্টের মাধ্যমে মাত্র দুইমাসের মধ্যেই পৃথিবীর সকল মানুষের শরীরে অভূতপূর্ব এক ভ্যাক্সিনের অনুপ্রবেশ ঘটলো। আর অনেকগুলো পুরস্কার এবং সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলে আমরীন বাংলাদেশে ফিরে এলো এবং এর ঠিক চৌদ্দ মাস দশদিন পর প্রথম খবরটা পেলো।

(৩)
টেক্সাসের খুব দামি একটা রেস্টুরেন্টে আলফী এবং তার স্ত্রী স্বর্ণা বসে আছে। আলফী তার হাতের কফিটার নাম কিভাবে আমেরিকানো হলো, সেই গল্প বলা শুরু করছিলো মাত্র। কিন্তু শুরু করতে গিয়ে স্বর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলো। মেয়েটার চোখের ভাষা এতদিনে বোঝা হয়ে গেছে আলফীর।

"শরীর খারাপ করছে তোমার?"
পেটে হাত দিয়ে ওপর-নিচ মাথা নাড়লো স্বর্ণা।

স্বর্ণা পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। হঠাৎ পিচ আইস-টি খেতে ইচ্ছা হচ্ছিলো ওর। দেশে থাকতে ওরা যখন দেখা করতো, তখনকার মতন। আলফী ওর চেয়ার ছেড়ে স্বর্ণার পাশে গিয়ে মাথায় হাত রাখলো।
"প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে পেটে" - চোখমুখ কুঁচকে বেশ কষ্ট করেই কথাগুলো বললো স্বর্ণা।

সবকিছু ঠিক থাকলে ডিসেম্বরে আলফীর বাবা হওয়ার কথা, প্রথমবারের মত। স্বর্ণার জন্য অভিজ্ঞতাগুলো যেমন নতুন, পাশে থাকা আলফীর জন্যও অনেকটা তাই। খুব একটা সমস্যা ছাড়াই সবকিছু চলছিলো। তবে স্বর্ণা যেমন বলছে, এমন তীব্র ব্যথা তো হওয়ার কথা না।

আলফী নিশ্চিত হওয়ার জন্য চট করে স্বর্ণার ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিলো। হরমোন ইন্ডিকেটরে একটা লাল দাগ বেশ লম্বা হয়ে আছে, এনডর্ফিন বেড়ে গেছে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক। শারীরিক কষ্টে মস্তিষ্ক এই হরমোন নির্গত করতে থাকে। তবে স্বর্ণা যতটা না ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, এই মুহূর্তে তার থেকে অনেকগুণ বেশি আতঙ্ক বোধ করছে। দুই পায়ের মাঝে সামান্য ভেজা অনুভব করছে ও। অথচ এমনটি তো কোনোভাবেই হওয়ার কথা না।

আলফী বুদ্ধিমান ছেলে, একবিন্দু দেরি না করে স্বর্ণাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে গেলো হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। কোনো একটা সমস্যা হয়েছে কোথাও। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে এখন।

ঘন্টা তিনেক পর আর্লিংটন মেমোরিয়াল হাসপাতালে ডক্টর ভিভিয়ান তার আঠারো বছরের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে অদ্ভুত ডেলিভারিটি করলেন। মাত্র বাইশ সপ্তাহে ভূমিষ্ঠ হয়েছে শিশুটি। মেমব্রেন রাপচার হওয়ার পর এছাড়া আর খুব বেশি কিছু করারও ছিলো না। প্রথমে ধারণা ছিলো খুব বেশিক্ষণ সারভাইভ করবে না বাচ্চাটি, কিন্তু সর্বসাকুল্যে সাত-আট ইঞ্চি লম্বায় সুস্থ সবল শিশুটি যেভাবে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদছে তাতে ডাক্তারের সেই সন্দেহ দূর হলেও হতভম্ব ভাব কাটলো না একবিন্দু।

হাসপাতালগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী দুইদিনের মধ্যে আরো প্রায় সাত-আট লক্ষ ক্ষুদ্রাকার শিশু জন্ম নেয়ার পর এবার সম্পূর্ণ অজানা এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীতে। অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সর্বপ্রথম একটা ভিন্ন সন্দেহ উঁকি দেয় বিজ্ঞানীদের মনে। সময়ক্ষেপণ না করে সিডিসি, এফবিএ এর সিনিয়র কয়েকজন অফিসারসহ বেশ বড় একটা দল রওনা দেয় বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে।

আমরীন নাওয়ার দ্যুতিকে মৃত অবস্থায় ঘরে পাওয়া যায় ২০৫৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। আর আস্তে আস্তে করে পরবর্তী একশ' বছরের মধ্যে পৃথিবীর মানব সভ্যতা বদলে যায় সম্পূর্ণভাবে।

(৪)
জনসংখ্যা কিংবা মানুষের লোভ আর এই পৃথিবীর সমস্যা নয়। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনে পরিপূর্ণ মনুষ্য সম্প্রদায় আকৃতিগতভাবে অর্ধেকে নেমে আসার পর হঠাৎ পৃথিবী সবুজ হতে থাকলো। প্রকৃতিতে যেন শত সহস্র বছর পর সৃষ্টি হলো এক রেনেসাঁর। অবারিত অক্সিজেন, সীমিত কার্বন-ডাই অক্সাইড, এবং একশ' বছর আগের তুলনায় ধরিত্রীর প্রতি ক্ষুধার্ত মানুষের চাহিদাও কমে গেলো অনেক। এই রকম প্রায় এগারো-বারো বিলিয়ন আত্মবিধ্বংসী মানুষ এবং তাদের লোভ নিয়েও এই পৃথিবী এখন অনায়াসে চলতে পারবে আরো কয়েকশ' বছর।

বন্ধুত্ব

রুমাইসা আহম্মেদ নাবা
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম

দোয়েল ও কোয়েল দুই বান্ধবী। আশ্চর্যজনকভাবে তাদের নাম মিলে গেছে। দোয়েলের বড় বোন আছে - দিয়া। তার সাথেও দোয়েল এত ঘনিষ্ঠ নয়, যতটা কিনা কোয়েলের সাথে। কোয়েলের দুটো ছোট বোন সৃষ্টি ও কৃষ্টি; দুজন জমজ। তার মা ওদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাই কোয়েল একটু বেশি স্বনির্ভর হয়ে গেছে। কিন্তু দোয়েল এখনো যেন ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। দোয়েলকে সহ্য করতেও প্রচুর ধৈর্য দরকার, যা কোয়েলের আছে। কোয়েল কতদিন দোয়েলের হোমওয়ার্ক করে দিয়েছে আর ওকে শাস্তি থেকে বাঁচিয়েছে, তার হিসাব নেই। তবে দোয়েলের বাচ্চা মন কোয়েল বোঝে। দোয়েলের মনে কোন প্যাঁচ নেই। আর সৎ একটা মেয়ে দোয়েল। দোয়েলকে সে খুব ভালোবাসে। তাইতো দোয়েলের সাথে ঝগড়া হলে বেশিদিন ধরে তা স্থায়ী হয় না। কোয়েলের কাছে আসলে দোয়েলেরও যেন বাচ্চামি বেড়ে যায়। যদিও বাড়িতেও সে খুব আদরের।

দেখতে দেখতে স্কুল জীবনের শেষ দিন চলে এলো। দোয়েল দিনটাতে বিশেষ কিছু করতে চায়। অনেক চিন্তা ভাবনা আর দিয়ার সাথে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করলো-সে আজ স্কুলে যাওয়ার অনেক আগে কোয়েলের বাসায় গিয়ে কোয়েলকে চমকে দেবে। ফুচকা, ভেলপুরি, চটপটি খাবে একসাথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। তারপর একসাথে স্কুলে যাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী দোয়েল চলল তার বান্ধবীর বাড়ি। কোয়েলের বাড়ির কাছাকাছি বাজারে এসে সে কোয়েলকে দেখতে পেল। রিকশা থামিয়ে সে কোয়েলকে ডাক দেয়, কিন্তু কোয়েল তাকে শুনতে পায় না।

বাজারে কোয়েল এসেছে দোয়েলের জন্য উপহার কিনতে। কী কিনবে তা ভাবতে ভাবতে কোয়েল রাস্তা পার হচ্ছিল। হঠাৎ কেউ কোয়েলকে হাত দিয়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, আর একটা আর্ত চিৎকার শোনা যায়। কোয়েল পিছনে ফিরে দেখে ট্রাকে চাপা পড়া নিথর দেহ পড়ে আছে দোয়েলের ...।

কিছুই হারিয়ে যায় না

এইচ এম আবির হোসেন
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম

কেন জানি আমার মনে হচ্ছে আমি যেখানেই যাই সেখানেই কোন এক সময় ছিলাম। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না যে কখন, সম্ভবত অতীত জীবনে, যদিও এই জীবনে অন্য কোনো সময় কিন্তু আমি প্রায় নিশ্চিত যে আমি ইতিমধ্যেই সব জায়গায় গিয়েছি যা আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি না। আমি কোনো শহরের, কোনো স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ এ একজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করেছি, আমি একই গল্প কেন জানি বারবার বলেছি, আবার আমি একই লোককে ভালোবাসছি।

আমি ঠিক সেখানেই থাকি, যেখানে আমি ছিলাম। যা আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে তা হল সমগ্র পৃথিবী একই প্যাটার্ন অনুসরণ করছে বলে মনে হচ্ছে। আমাদের সকলের কেন জানি একই লক্ষ্য রয়েছে।

আমরা সকলেই মনে হয় একই গল্পে বাস করছি, একই লোকদের ভালবাসি, এবং আমাদের হৃদয় কে জানি একইভাবে ভেঙে যাচ্ছে। এটি এমন ধারনা, যা আমাকে বিশ্বের সাথে সংযুক্ত রাখে, যা আমাকে কিছুটা কম আতঙ্কিত করে এবং অনেক কম একাকী বোধ করায়।

এই চিন্তা আমাকে বিশ্বাস করে তুলেছে এমনভাবে, আমি প্রায় প্রবাহিত হতে পারি নদীর মতো। যেহেতু পুরো পৃথিবী আমার আশ্রয়স্থল, আমার মনে হয় আমি এখানে যুগ যুগ ধরে থাকছি। আপনি বিশ্বাস করুন আপনার হারিয়ে যাওয়া ভালবাসা পরবর্তী স্টেশনে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। যে সমস্ত স্বপ্ন আপনি দেখতে ভুলে গেছেন সেগুলি অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা তৈরি শিল্পের মাধ্যমে আপনার কাছে ফিরে আসবে।

আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি - যে এই পৃথিবীতে আসলে কিছুই হারিয়ে যায় না। আমরা সবাই একটি বৃত্তের মধ্যে ভ্রমণ করছি, এবং যেহেতু চেনাশোনাগুলির কোন শেষ নেই, আমি মনে করি যে আমরা যা কিছু হারিয়েছি তা আবার পাওয়া যাবে, এবং আমরা যা ছিলাম তা পুনর্জন্ম হবে। এই ধারণা আমাকে আশা দেয়। সত্যি বললে দিনশেষে আসলেই কিছুই হারিয়ে যায় না।

ANNUAL MAGAZINE | 2022

BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS

Mirpur Cantonment, Dhaka - 1216

www.bup.edu.bd